সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী

নামায-রোযার হাকীকত

নামায-রোযার হাকীকত

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ৯

৩৪তম প্রকাশ

রবিউল আউয়াল	১৪২৫
বৈশাখ	১৪১১
এপ্রিল	২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১১.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

خطبات حصه سوم اور چهارم -এর বাংলা অনুবাদ

NAMAJ-ROJAR HAKIKAT (Virtue of Saum and Salat) by Sayiid Abul A'la Maududi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price Taka 11.00 Only.

সূচীপত্র

ইবাদাত	৫
নামায	১৩
নামাযে কি পড়েন	২০
জামায়াতের সাথে নামায	৩০
নামাযের ফল পাওয়া যায় না কেন	৪০
রোযা	৪৮
রোযার মূল উদ্দেশ্য	৫৪
রোযা ও আত্মসংযম	৬০

ইবাদাত

'ইসলামের হাকীকত' গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধে 'দ্বীন' ও 'শরীয়াত' এ শব্দ দু'টির প্রকৃত অর্থ এবং ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আমি 'ইবাদাত' শব্দটির বিস্তারিত অর্থ আপনাদের সামনে পেশ করবো। এ শব্দটি সর্বসাধারণ মুসলমান প্রায়ই বলে থাকে ; কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ অনেকেই জানে না। আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে বলেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ ۝ - الذريت ٥٦

"আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে কেবল আমারই ইবাদাত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬

এ থেকে নিসন্দেহে বুঝা গেল যে, মানুষের জন্ম, জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আল্লাহ তাআলার ইবাদাত এবং বন্দেগী ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন আপনারা সহজেই বুঝতে পারেন যে, 'ইবাদাত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ জেনে নেয়া আমাদের পক্ষে কতখানি জরুরী। এ শব্দটির অর্থ না জানলে যে মহান উদ্দেশ্যে আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা আপনি কিছুতেই লাভ করতে পারেন না। আর যে বস্তু তার উদ্দেশ্য লাভ করতে পারে না তা ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে থাকে।

চিকিৎসক রোগীকে নিরাময় করতে না পারলে বলা হয় যে, সে চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়েছে, কৃষক ভাল ফসল জন্মাতে না পারলে কৃষিকার্যে তার ব্যর্থতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। তেমনি আপনারা যদি আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য লাভ অর্থাৎ ইবাদাত করতে না পারেন তবে বলতে হবে যে, আপনাদের জীবন ব্যর্থ হয়েছে। এজন্যই আমি আশা করি আপনারা এ 'ইবাদাত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য জানার জন্য বিশেষ মনোযোগী হবেন এবং তা আপনাদের হৃদয়-মগযে বদ্ধমূল করে নিবেন। কারণ মানব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা এরই ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে।

ইবাদাত শব্দটি আরবী 'আবদ' (عبد) হতে উদ্ভূত হয়েছে। 'আবদ' অর্থ দাস ও গোলাম। অতএব 'ইবাদাত' শব্দের অর্থ হবে বন্দেগী ও গোলামী করা। যে ব্যক্তি অন্যের দাস সে যদি তার বাস্তবিকই মনিবের সমীপে একান্ত অনুগত হয়ে থাকে এবং তার সাথে ঠিক ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করে, তবে একে বলা হয় বন্দেগী ও ইবাদাত। পক্ষান্তরে কেউ যদি কারো চাকর হয় এবং মনিবের কাছ থেকে পুরোপুরি বেতন আদায় করে, কিন্তু তবুও সে যদি ঠিক চাকরের

ন্যায় কাজ না করে তবে বলতে হবে যে, সে নাফরমানী ও বিদ্রোহ করছে। আসলে একে অকৃতজ্ঞতা বলাই বাঞ্ছনীয়। তাই সর্বপ্রথম আপনাকে জানতে হবে, মনিবের সামনে 'চাকরের' ন্যায় কাজ করা এবং তার সমীপে আনুগত্য প্রকাশ করার উপায় কি হতে পারে।

বান্দাহ বা চাকরকে প্রথমত মনিবকে 'প্রভু' বলে স্বীকার করতে হবে এবং মনে করতে হবে যে, যিনি আমার মালিক, যিনি আমাকে দৈনন্দিন রুজী দান করেন এবং যিনি আমার হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন তাঁরই অনুগত হওয়া আমার কর্তব্য। তিনি ছাড়া অন্য কেউই আমার আনুগত্য লাভের অধিকারী নয়। সকল সময় মনিবের আনুগত্য করা, তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর অনুবর্তিতা মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ না করা, মনিবের বিরুদ্ধে মনে কোনো কথার স্থান না দেয়া এবং অন্য কারো কথা পালন না করাই বান্দাহর দ্বিতীয় কর্তব্য। গোলাম সবসময়ই গোলাম ; তার একথা বলার কোনো অধিকার নেই যে, আমি মনিবের এ আদেশ মানবো আর অমুক আদেশ মানবো না। কিংবা আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মনিবের গোলাম আর অন্যান্য সময় আমি তার গোলামী হতে সম্পূর্ণ আযাদ ও মুক্ত।

মনিবের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন এবং তার সমীপে আদব রক্ষা করে চলা বান্দার তৃতীয় কাজ। আদব ও সম্মান প্রকাশের যে পন্থা মনিব নির্দিষ্ট করে দেবেন তাই অনুসরণ করা, সালাম দেয়ার জন্য মনিব যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেই সময়ে নিশ্চিতরূপে উপস্থিত হওয়া এবং মনিবের আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকারে নিজের প্রতিজ্ঞা ও আন্তরিক নিষ্ঠা প্রমাণ করা একান্ত আবশ্যক।

এ তিনটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে যে কার্যটি সম্পন্ন হয় আরবী পরিভাষায় তাকেই বলে 'ইবাদাত'। প্রথমত, মনিবের দাসত্ব স্বীকার, দ্বিতীয়ত, মনিবের আনুগত্য এবং তৃতীয়ত, মনিবের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ۝ - الذريت ٥٦

এর প্রকৃত মর্ম হচ্ছে ঃ আল্লাহ তাআলা জ্বিন ও মানব জাতিকে একমাত্র এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যে, তারা কেবল আল্লাহ তাআলারই দাসত্ব করবে, অন্য কারো নয়, কেবল আল্লাহর হুকুম পালন করবে, এছাড়া অন্য কারো হুকুম অনুসরণ করবে না এবং কেবল তাঁরই সামনে সম্মান ও সম্ভ্রম প্রকাশের জন্য মাথা নত করবে, অন্য কারো সামনে নয়। এ তিনটি জিনিসকে আল্লাহ তাআলা বুঝিয়েছেন এ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'ইবাদাত' দ্বারা। যেসব আয়াতে

আল্লাহ তাআলা ইবাদাতের নির্দেশ দিয়েছেন তার অর্থ এটাই। আমাদের শেষ নবী এবং তাঁর পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের যাবতীয় শিক্ষার সারকথা হচ্ছে ঃ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না" অর্থাৎ দাসত্ব ও আনুগত্য লাভের যোগ্য সারা জাহানে একজনই মাত্র বাদশাহ আছেন—তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা ; অনুসরণযোগ্য মাত্র একটি বিধান বা আইন আছে—তাহলো আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা এবং একটি মাত্র সত্তাই আছে, যার পূজা-উপাসনা, আরাধনা করা যেতে পারে। আর সেই সত্তাই হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ।

ইবাদাত শব্দের এ অর্থ আপনি স্মরণ রাখুন এবং আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে থাকুন। একটি চাকর যদি মনিবের নির্ধারিত কর্তব্য পালন না করে বরং তাঁর সামনে কেবল হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, লক্ষ বার কেবল তার নাম জপে, তবে এ চাকরটি সম্পর্কে আপনি কি বলবেন ? মনিব তাকে অন্যান্য মানুষের প্রাপ্য আদায় করতে বলেন। কিন্তু সে কেবল সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে মনিবের সামনে মাথা নত করে দশবার সালাম করে এবং আবার হাত বেঁধে দাঁড়ায়। মনিব তাকে অনিষ্টকর কাজগুলো বন্ধ করতে আদেশ করেন। কিন্তু সে সেখান থেকে একটুও নড়ে না। বরং সে কেবল সিজদাহ করতে থাকে। মনিব তাকে চোরের হাত কাটতে বলেন। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে থেকে সুললিত কণ্ঠে বিশবার পড়তে বা উচ্চারণ করতে থাকে—'চোরের হাত কাট' কিন্তু সে একবারও এমন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে না যার অধীন চোরের হাত কাটা সম্ভব হবে। এমন চাকর সম্পর্কে কি মন্তব্য করবেন ? আপনি কি বলতে পারেন যে, সে প্রকৃতপক্ষে মনিবের বন্দেগী ও ইবাদাত করছে ? আপনার কোনো চাকর এরূপ করলে আপনি তাকে কি বলবেন তা আমি জানি না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আল্লাহর যে চাকর এরূপ আচরণ করে তাকে আপনি 'বড় আবেদ' (ইবাদাতকারী, বুযর্গ ইত্যাদি) নামে অভিহিত করেন। এরা সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলার কত শত হুকুম পাঠ করে, কিন্তু সেগুলো পালন করার এবং কাজে পরিণত করার জন্য একটু চেষ্টাও করে না। বরং কেবল নফলের পর নফল পড়তে থাকে, আল্লাহর নামে হাজার দানা তাসবীহ জপতে থাকে এবং মধুর কণ্ঠে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতে থাকে। আপনি তার এ ধরনের কার্যাবলী দেখেন, আর বিস্মিত হয়ে বলেন ঃ 'ওহে ! লোকটা কত বড় আবেদ আর কত বড় পরহেযগার।' আপনাদের এ ভুল ধারণার মূল কারণ এই যে, আপনারা 'ইবাদাত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ মোটেই জানেন না।

আর একজন চাকরের কথা ধরুন। সে রাত-দিন কেবল পরের কাজ করে, অন্যের আদেশ শুনে এবং পালন করে, অন্যের আইন মেনে চলে এবং তার প্রকৃত মনিবের যত আদেশ ও ফরমানই হোক না কেন, তার বিরোধিতা করে। কিন্তু 'সালাম' দেয়ার সময় সে তার প্রকৃত মনিবের সামনে উপস্থিত হয় এবং মুখে কেবল তার নাম জপতে থাকে। আপনাদের কারো কোনো চাকর এরূপ করলে আপনারা কি করবেন ? তার 'সালাম' কি তার মুখের ওপর নিক্ষেপ করবেন না ? মুখে মুখে সে যখন আপনাকে মনিব আর মালিক বলে ডাকবে তখন আপনি কি তাকে একথা বলবেন না যে, তুই ডাহা মিথ্যাবাদী ও বেঈমান ; তুই আমার বেতন খেয়ে অন্যের তাবেদারী করিস, মুখে আমাকে মনিব বলে ডাকিস, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেবল অন্যেরই কাজ করে বেড়াস ? এটা নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির কথা এটা কারো বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা ! যারা রাত-দিন আল্লাহর আইন ভঙ্গ করে, কাফের ও মুশরিকদের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে এবং নিজেদের বাস্তব কর্মজীবনে আল্লাহর বিধানের কোনো পরোয়া করে না ; তাদের নামায-রোযা, তাসবীহ পাঠ, কুরআন তেলাওয়াত, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিকে আপনি ইবাদাত বলে মনে করেন। এ ভুল ধারণারও মূল কারণ ইবাদাত শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানা।

আর একটি চাকরের উদাহরণ নিন। মনিব তার চাকরদের জন্য যে ধরনের পোশাক নির্দিষ্ট করেছেন, মাপ-জোখ ঠিক রেখে সে ঠিক সেই ধরনের পোশাক পরিধান করে, বড় আদব ও যত্ন সহকারে সে মনিবের সামনে হাজির হয়, প্রত্যেকটি হুকুম শুনামাত্রই মাথা নত করে শিরোধার্য করে নেয় যেন তার তুলনায় বেশী অনুগত চাকর আর কেউই নয়। 'সালাম' দেয়ার সময় সে একেবারে সকলের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং মনিবের নাম জপবার ব্যাপারে সমস্ত চাকরের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিষ্ঠা প্রমাণ করে ; কিন্তু অন্যদিকে এ ব্যক্তি মনিবের দুশমন এবং বিদ্রোহীদের খেদমত করে, মনিবের বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে এবং মনিবের নাম পর্যন্ত দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে তারা যে চেষ্টাই করে, এ হতভাগা তার সহযোগিতা করে ; রাতের অন্ধকারে সে মনিবের ঘরে সিঁদ কাটে এবং ভোর হলে বড় অনুগত চাকরটির ন্যায় হাত বেঁধে মনিবের সামনে হাজির হয়। এ চাকরটি সম্পর্কে আপনি কি বলবেন ? আপনি নিশ্চয়ই তাকে মুনাফিক, বিদ্রোহী ও নিমকহারাম প্রভৃতি নামে অভিহিত করতে একটুও কুণ্ঠিত হবেন না। কিন্তু আল্লাহর কোনো চাকর যখন এ ধরনের হাস্যকর আচরণ করতে থাকে তখন তাকে আপনারা কি বলতে থাকেন ? তখন আপনারা কাউকে 'পীর সাহেব', কাউকে 'হযরত মাওলানা', কাউকে 'বড় কামেল', 'পরহেযগার' প্রভৃতি নামে

ভূষিত করেন। এর কারণ এই যে, আপনারা তাদের মুখে মাপ মত লম্বা দাড়ি দেখে, তাদের পায়জামা পায়ের গিরার দু' ইঞ্চি ওপরে দেখে, তাদের কপালে নামাযের কালো দাগ দেখে এবং তাদের লম্বা লম্বা নামায ও মোটা মোটা দানার তাসবীহ্ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন ; এদেরকে বড় দ্বীনদার ও ইবাদাতকারী বলে মনে করেন। এ ভুল শুধু এজন্য যে, 'ইবাদাত' ও দ্বীনদারীর ভুল অর্থই আপনাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে।

আপনি হয়তো মনে করেন, হাত বেঁধে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো, হাঁটুর ওপর হাত রেখে মাথা নত করা, মাটিতে মাথা রেখে সিজদা করা এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা—শুধু এ কয়টি কাজই প্রকৃত ইবাদাত। হয়ত আপনি মনে করেন, রমযানের প্রথম দিন হতে শাওয়ালের চাঁদ উঠা পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখার নাম ইবাদাত। আপনি হয়তো এটাও মনে করেন যে, কুরআন শরীফের কয়েক রুকূ' পাঠ করার নামই ইবাদাত, আপনি বুঝে থাকেন মক্কা শরীফে গিয়ে কা'বা ঘরের চারদিকে তাওয়াফ করার নামই ইবাদাত। মোটকথা, এ ধরনের বাহ্যিক রূপকে আপনারা 'ইবাদাত' মনে করে নিয়েছেন এবং এ ধরনের বাহ্যিক রূপ বজায় রেখে উপরোক্ত কাজগুলো কেউ সমাধা করলেই আপনারা মনে করেন যে, ইবাদাত সুসম্পন্ন করেছে এবং وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ (الذريت ٥٦)- এর উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছে। তাই জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে সে একেবারে আযাদ—নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী কাজ করে যেতে পারে।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাআলা যে ইবাদাতের জন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যে 'ইবাদাত' করার আদেশ আপনাকে দেয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। সেই ইবাদাত এই যে, আপনি আপনার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তেই আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে চলবেন এবং আল্লাহর আইনের বিরোধী এ দুনিয়ায় যা কিছু প্রচলিত আছে তা অনুসরণ করতে আপনি একেবারে অস্বীকার করবেন। আপনার প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি গতিবিধি আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে হতে হবে। এ পন্থায় যে জীবনযাপন করবেন তার সবটুকুই ইবাদাত বলে গণ্য হবে। এ ধরনের জীবনে আপনার শয়ন-জাগরণ, পানাহার, চলা-ফিরা, কথা বলা, আলোচনা করাও ইবাদাত বিবেচিত হবে। এমন কি নিজ স্ত্রীর কাছে যাওয়া এবং নিজের সন্তানদেরকে স্নেহ করাও ইবাদাতের শামীল হবে। যেসব কাজকে আপনারা 'দুনিয়াদারী' বলে থাকেন তাও 'ইবাদাত' এবং 'দ্বীনদারী' হতে পারে—যদি সকল বিষয় আপনি আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্য থেকে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে সমাধা করেন ;

আর পদে পদে এদিকে লক্ষ্য রাখেন যে, আল্লাহর কাছে কোন্‌টা জায়েয আর কোন্‌টা নাজায়েয, কি হালাল আর কি হারাম, কি ফরয আর কি নিষেধ, কোন্‌ কাজে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট আর কোন্‌ কাজে হন অসন্তুষ্ট। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনি রুজি ও অর্থোপার্জনের জন্য বের হন। এ পথে হারাম উপার্জনের অসংখ্য সহজ উপায় আপনার সামনে আসবে। এখন আপনি যদি আল্লাহকে ভয় করে সেই সুযোগ গ্রহণ না করেন এবং কেবল হালাল রুজি ও অর্থ উপার্জন করেন তবে এ কাজে আপনার যে সময় লেগেছে তা সবই ইবাদাত এবং এ হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ ঘরে এনে আপনি নিজে খান আর পরিবার-পরিজনের খাদ্যের ব্যবস্থা করেন, সেই সাথে যদি আল্লাহর নির্ধারিত অন্যান্য হকদারের হকও আদায় করেন, তাহলে এসব কাজেও আপনি অসীম সওয়াব পাবেন। পথ চলার সময় আপনি পথের কাঁটা দূর করেন এ ধারণায় যে, এটা দ্বারা আল্লাহর কোনো বান্দাহ্ কষ্ট পেতে পারে তবে এটাও আপনার ইবাদাত বলে গণ্য হবে। আপনি কোনো রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা করলেন, কোনো ব্যক্তিকে পথ চলতে সাহায্য করলেন, কিংবা কোনো বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করলেন তবে এটাও ইবাদাত হবে। কথাবার্তা বলতে আপনি মিথ্যা, গীবত, কুৎসা রটনা, অশ্লীল কথা বলে পরের মনে আঘাত দেয়া ইত্যাদি পরিহার করেন এবং আল্লাহর ভয়ে কেবল সত্য কথাই বলেন তবে যতক্ষণ সময় আপনার এ কাজে ব্যয় হবে, তা সবই ইবাদাতে অতিবাহিত হবে।

অতএব চেতনা লাভের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর আইন অনুযায়ী চলা এবং তাঁরই নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করার নামই হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত। এ ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। এ ইবাদাত সবসময়ই হওয়া চাই, এ ইবাদাতের জন্য কোনো নির্দিষ্ট প্রকাশ্য রূপ নেই, কেবল প্রতিটি রূপের প্রত্যেক কাজেই আল্লাহর ইবাদাত হতে হবে। আপনি একথা বলতে পারেন না যে, আমি অমুক সময় আল্লাহর বান্দাহ আর অমুক সময় আল্লাহর বান্দাহ্ নই। আপনি একথাও বলতে পারেন না যে, অমুক সময় আল্লাহর ইবাদাতের জন্য, আর অমুক সময় আল্লাহর কোনো ইবাদাত করতে হয় না। এ আলোচনা দ্বারা আপনারা ইবাদাত শব্দের অর্থ ভালরূপে জানলেন একথা বুঝতে পারলেন যে, প্রত্যেক মুহূর্তে সকল অবস্থায় আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করে চলার নামই ইবাদাত। এখানে আপনি এ প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে এ নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদিকে কি বলা যায় ? উত্তরে আমি বলবো যে, এসব ইবাদাত বটে, এ ইবাদাতগুলোকে আপনার ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে শুধু এজন্য যে, আপনার জীবনের প্রধান ও বৃহত্তম উদ্দেশ্য যে, প্রতি মূহূর্তে ও প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর ইবাদাত করা, সেই বিরাট

উদ্দেশ্য আপনি এসবের মাধ্যমে লাভ করবেন। নামায আপনাকে দৈনিক পাঁচবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তুমি আল্লাহ তাআলার দাস—তাঁরই বন্দেগী করা তোমার কর্তব্য ; রোযা বছরে একবার পূর্ণ একটি মাস আপনাকে এ বন্দেগী করার জন্যই প্রস্তুত করে, যাকাত আপনাকে বার বার মনে করিয়ে দেয় যে, তুমি যে অর্থ উপার্জন করেছো তা আল্লাহর দান, তা কেবল তোমার খেয়াল-খুশী মত ব্যয় করতে পার না। বরং তা দ্বারা তোমার মালিকের হক আদায় করতে হবে। হজ্জ মানব মনে আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির এমন চিত্র অঙ্কিত করে যে, একবার তা মুদ্রিত হলে সমগ্র জীবনেও মন হতে তা মুছে যেতে পারে না। এসব বিভিন্ন ইবাদাত আদায় করার পর আপনার সমগ্র জীবন যদি আল্লাহর ইবাদাতে পরিণত হবার উপযুক্ত হয়, তবেই আপনার নামায প্রকৃত নামায হবে, রোযা খাঁটি রোযা হবে, যাকাত সত্যিকার যাকাত এবং হজ্জ আসল হজ্জ হবে এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ উদ্দেশ্য হাসিল না হলে কেবল রুকূ'-সিজদাহ, অনাহার-উপবাস, হজ্জের অনুষ্ঠান পালন করা এবং যাকাতের নামে টাকা ব্যয় করলে আপনার কিছুই লাভ হবে না। বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলোকে মানুষের একটি দেহের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এতে প্রাণ থাকলে এবং চলাফিরা বা কাজ-কর্ম করতে পারলে নিসন্দেহে তা জীবিত মানুষের দেহ, অন্যথায় তা একটি প্রাণহীন দেহ মাত্র। লাশের চোখ, কান, হাত, পা সবকিছুই বর্তমান থাকে ; কিন্তু প্রাণ থাকে না বলেই তাকে আপনারা মাটির গর্তে পুতে রাখেন। তদ্রূপ নামাযের আরকান-আহকাম যদি ঠিকভাবে আদায় করা হয় কিংবা রোযার শর্তাবলীও যদি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়, কিন্তু হৃদয় মনে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর প্রেম-ভালবাসা এবং তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করার ভাবধারা বর্তমান না থাকে —ঠিক যে জন্য এসব আপনার ওপর ফরয করা হয়েছিল, তবে তাও একটি প্রাণহীন ও অর্থহীন জিনিস হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আপনাদের ওপর এই যে, বিভিন্ন ইবাদাত ফরয করা হয়েছে, এসব কিভাবে এবং কি উপায়ে আপনাকে সেই আসল ও বৃহত্তম ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত করে, সেই ইবাদাতগুলোকে যদি আপনি বুঝে শুনে আদায় করেন, তবে তা থেকে আপনার জীবনে কি প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে পরবর্তী প্রবন্ধে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো—ইনশাআল্লাহ।

নামায

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আমি ইবাদাতের প্রকৃত অর্থ বর্ণনা করেছি। এ 'ইবাদাতের' উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে আল্লাহ তাআলার খাঁটি বান্দাহ হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য ইসলামে কয়েকটি নির্দিষ্ট ইবাদাত ফরয করা হয়েছে। সুতরাং এবারে কেবল 'নামায' সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে চাই।

আপনারা পূর্বের প্রবন্ধে জানতে পেরেছেন যে, 'ইবাদাত'-এর আসল অর্থ বন্দেগী বা দাসত্ব করা। তাই আপনাকে যখন শুধু দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তখন আপনি কখনো এবং কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর দাসত্ব হতে মুক্ত হতে পারেন না। 'এত মিনিট কিংবা এত ঘন্টার জন্য আমি আল্লাহর দাস, অন্য সকল সময় তা নই'—একথা আপনি যেমন বলতে পারেন না, তদ্রূপ আপনি একথাও বলতে পারেন না যে, 'আমি এতক্ষণ আল্লাহর ইবাদাতে অতিবাহিত করবো এবং অন্য সময়ে আমার পূর্ণ আযাদী—তখন যা ইচ্ছা তাই করবো। যেহেতু আল্লাহর গোলাম—আল্লাহর দাস হিসেবেই আপনার জন্ম হয়েছে। কেবল তাঁর গোলামী ও দাসত্ব করার জন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব আপনার সমগ্র জীবনই তাঁর গোলামী ও দাসত্বে অতিবাহিত হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়, জীবনের কোনো একটি মুহূর্তও আপনি তাঁর 'ইবাদাত' ও দাসত্ব হতে মুক্ত হতে পারেন না।

পূর্বে একথাও আপনাকে বলেছি যে, দুনিয়ার কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে এক কোণায় বসে যাওয়া এবং 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' করার নাম ইবাদাত নয়। বরং এ দুনিয়ায় আপনি যে কাজই করুন না কেন তা ঠিক আল্লাহর আইন ও বিধান অনুসারে করার অর্থই হচ্ছে ইবাদাত। আপনার শয়ন-নিদ্রা, আপনার জাগরণ ও বিশ্রাম, পানাহার, চলা-ফেরা—মোটকথা সবকিছুই আল্লাহর আইন ও বিধান অনুযায়ী আপনাকে করতে হবে। আপনার স্ত্রী-পুত্র, ভাই-ভগ্নি এবং আত্মীয়গণের সাথে ঠিক আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। বন্ধু-বান্ধবের সাথে হাসি-তামাশা ও কথাবার্তা বলার সময়ও আপনার স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা আল্লাহর দাসত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্ত নই। কামাই রোযগারের টাকা-পয়সা আদান-প্রদানের সময়ও আপনাকে প্রত্যেকটি কাজে ও কথায় আল্লাহর বিধি-নিষেধ লক্ষ্য রাখতে হবে এবং কখনো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে পারেন না। রাতের অন্ধকারে কোনো পাপের কাজ করা যদি খুবই সহজ হয়ে পড়ে এবং তা করলে কেউ দেখতে পাবে না বলে আপনি মনে করেন, ঠিক তখনো আপনি স্মরণ রাখবেন যে, আর কেউ দেখুক আর না-ই

দেখুক, আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখছেন এবং আপনার মনে আল্লাহর ভয় বদ্ধমূল হওয়া উচিত, মানুষের ভয় নয়। গভীর জঙ্গলে বসেও যদি কোনো পাপের কাজ করতে ইচ্ছা করেন এবং যদি মনে করেন পুলিশ বা অন্য কোনো লোক তা দেখতে পাবে না, তখনো আপনি কেবল আল্লাহকে ভয় করে পাপ পরিহার করবেন। যখন মিথ্যা কথা, দুর্নীতি, বেঈমানী, যুলুম ও শোষণ করে বহু স্বার্থ লাভ করতে পারেন এবং আপনাকে বাধা দেয়ার কেউ না থাকে, তখনো আপনি আল্লাহকে ভয় করবেন এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির আশংকায় এ স্বার্থের কাজ থেকে বিরত থাকবেন। পক্ষান্তরে সততা ও ন্যায়-নীতি রক্ষা করে চলায় আপনাকে যদি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্তও হতে হয়, তথাপি আপনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়ই এ ক্ষতি স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না। অতএব দুনিয়ার বিপুল কর্মজীবন পরিত্যাগ করে (ঘর বা মসজিদের) কোণে বসে তাসবীহ পড়াকে 'ইবাদাত' বলা যায় না। বস্তুত দুনিয়ার এ গোলক ধাঁধায় জড়িত হয়ে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করার নামই 'ইবাদাত'। মুখে কেবল 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' শব্দ উচ্চারণ করাকেই আল্লাহর 'যিকর' বলা যায় না। দুনিয়ার কাজ-কর্ম ও ঝামেলার কঠিন জালে জড়িত হয়েও আল্লাহকে বিস্মৃত না হওয়াই আসল আল্লাহর যিকর। যেসব জিনিস মানুষকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দেয় তাতে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বিস্মৃত না হওয়া, বড় বড় স্বার্থ হাসিলের লোভ এবং বিরাট ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর আইন লংঘন করার যখন সুযোগ এসে যায় তখনও আল্লাহকে স্মরণ করা এবং দৃঢ়তার সাথে তাঁর আইন অনুসরণ করে চলাই সত্যিকার 'যিকরুল্লাহ' বা আল্লাহর যিকর। এ যিকরের দিকে ইংগিত করা হয়েছে কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ - الجمعة ١٠

"নামায পূর্ণরূপে আদায় হয়ে গেলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় ; আল্লাহর দান জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা কর এবং এ প্রচেষ্টা ব্যাপদেশে আল্লাহকে খুব বেশী করে স্মরণ কর। তবেই সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।"—সূরা আল জুমআ ঃ ১০

'ইবাদাতের' এ অর্থ মনে জাগরূক রাখুন এবং গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, এ বিরাট ও বৃহত্তম 'ইবাদাত' যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য কি কি জিনিস অপরিহার্য এবং নামায সেসব জিনিসকে মানুষের মধ্যে কিভাবে সৃষ্টি করে। আল্লাহর খাঁটি 'বান্দাহ' হওয়ার জন্য বার বার একথা স্মরণ করা

আবশ্যক যে, আপনি আল্লাহর বান্দাহ্ এবং প্রত্যেক সময় ও প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সেই আল্লাহর বন্দেগী করাই হচ্ছে আপনার কাজ। একথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া এজন্য আবশ্যক যে, মানুষের মনে একটি 'শয়তান' সবসময়ই উপস্থিত থাকে ; সে সবসময়ই মানুষকে নিজের 'দাস' বানাতে চেষ্টা করে। শয়তানের এ প্ররোচনা ও গোলক ধাঁধার জাল ছিন্ন করার জন্য মানুষকে প্রত্যহ বার বার একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া একান্ত আবশ্যক যে, "তুমি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার দাস, তিনি ছাড়া তুমি আর কারো দাস নও—না শয়তানের, না কোনো মানুষের।" একথারই অনুভূতি মানুষের মনে জাগরূক করে দেয় নামায। সকাল বেলা ঘুম ভাংতেই তা সর্বপ্রথম এবং সকল কাজের আগে আপনাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং দিনের বেলা যখন নানা প্রকার কাজে আপনি মশগুল থাকেন তখনো তিন-তিনবার আপনার মনে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং রাত্রিকালে যখন নিদ্রার সময় উপস্থিত হয়, তখন শেষবারের মত এরই পুনরাবৃত্তি করে। এরূপে আল্লাহর 'দাস' হওয়ার কথা মানুষকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া নামাযের প্রথম উপকার। এজন্যই কুরআন মজীদে নামাযকে 'যিকর' নামে অভিহিত করা হয়েছে, অর্থাৎ এর দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা হয়।

তারপর আপনাকে এ জীবনের পদে পদে আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালন করে চলতে হবে, কাজেই কর্তব্য জ্ঞান ও দায়িত্ববোধ আপনার মনে সদা জাগ্রত থাকা বাঞ্ছনীয় এবং তা পালন করার অভ্যাসও আপনার থাকা দরকার। 'কর্তব্য' কাকে বলে এটা যে জানে না সে কখনও আল্লাহর বিধান পালন করতে পারে না। পক্ষান্তরে কর্তব্যের অর্থ যে জানে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে সেই কর্তব্য পালন করার কোনো আগ্রহ উদ্যোগ তার না থাকে তবে রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টার জন্য তাকে যে শত সহস্র আইন বিধান দেয়া হবে তা যে সে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে পালন করবে, এমন ভরসা কিছুতেই করা যায় না।

যারা পুলিশ কিংবা সৈন্য বিভাগে কাজ করছেন তারা জানেন যে, এ দু'টি বিভাগে কর্তব্যানুভূতি এবং যথাযথভাবে কর্তব্য পালনের ট্রেনিং কত কঠোরতার সাথে দেয়া হয়। রাত-দিনের মধ্যে একাধিকবার বিউগল বাজানো হয়। সৈনিকদেরকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাদের দ্বারা কুচকাওয়ায করানো হয়। এসব কেবলমাত্র কর্তব্য পালনে অভ্যস্ত করার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই এ সমস্ত ব্যাপারে যারা অক্ষম, নিষ্কর্মা ও অযোগ্য প্রমাণিত হয়, যারা 'বিউগলের' আওয়ায শুনেও ঘরে বসে থাকে কিংবা যারা কুচকাওয়াযের সময় নির্দেশ অনুসারে সাড়া না দেয় তাদেরকে প্রথমেই

বরখাস্ত করা হয়। অদ্রূপ নামাযও দিন-রাত পাঁচবার 'বিউগল' বাজায় ; সেই 'বিউগল' শুনা মাত্র আল্লাহর সৈনিকগণ দৌড়িয়ে আসবে এবং প্রমাণ করবে যে, তারা সকল অবস্থাতেই আল্লাহর আইন পালন করতে প্রস্তুত। এ 'বিউগল' শুনেও যারা বসে থাকে, নিজ স্থান হতে একটুও নড়তে যারা প্রস্তুত না হয়, তারা 'কর্তব্যের' অর্থই জানে না, কিংবা কর্তব্যের অর্থ বুঝা সত্ত্বেও আল্লাহর সৈন্য বাহিনীর মধ্যে শামিল হওয়ার যোগ্যতাই তাদের নেই।

এ কারণেই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যারা আযানের আওয়ায শুনেও নিজেদের ঘর হতে বের হয় না তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে আমার ইচ্ছা হয়।" এবং এজন্যই হাদীস শরীফে নামায পড়াকেই কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্যের প্রধান চিহ্ন বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। নামায পড়ার জন্য যে ব্যক্তি জামায়াতে হাজির না হতো হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের যুগে তাকে মুসলমানই বলা হতো না। এমনকি যেসব মুনাফিকের মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল তারাও নামাযের জামায়াতে শামিল হতে বাধ্য হতো। এজন্যই কুরআন শরীফে মুনাফিকদেরকে এরূপে তিরস্কার করা হয়নি যে, তারা নামায পড়ে না বরং বলা হয়েছে যে, তারা মনের ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিষ্ঠা সহকারে নামাযে দাঁড়ায় না, দাঁড়ায় নেহায়েত অবহেলা, অনিচ্ছা ও উপেক্ষা সহকারে ঃ

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى -

এসব কথা দ্বারা নিসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, বে-নামাযীকে 'মুসলমান' মনে করার কোনোই অবকাশ নেই। কারণ, ইসলাম এক নিছক বিশ্বাসমূলক ধর্ম নয় যে, 'কতগুলো কথা' মনে মনে বিশ্বাস করলেই কর্তব্য পালন হয়ে যাবে। বরং এটা সম্পূর্ণ কর্মময় বাস্তব ধর্ম। এমন বাস্তব যে, প্রত্যেকটি মুহূর্তে ইসলাম অনুযায়ী কাজ করা এবং কুফরী ও ফাসেকীর বিরুদ্ধে অনবরত লড়াই করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। এরূপ বিরাট কর্মময় জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে আল্লাহর বিধান পালনের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি সেরূপ প্রস্তুত থাকে না, সে ইসলামের জন্য একেবারে নিষ্কর্মা। ঠিক এ কারণেই দিন-রাতের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানগণ প্রকৃতপক্ষে মুসলমান কিনা এবং বাস্তব কর্মজীবনে সে আল্লাহর হুকুম পালন করতে প্রস্তুত কিনা, এর বাস্তব পরীক্ষা এবং প্রমাণ নেবার জন্যই এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যবস্থা। আল্লাহর প্যারেডের 'বিউগল' শুনে কোনো মুসলমান যদি বিন্দুমাত্র সাড়া না দেয়, তবে পরিষ্কার প্রমাণিত হবে যে, সে ইসলামের বিধান মত কর্মজীবন যাপন করতে প্রস্তুত নয়। এরপর

যদি সে আল্লাহকে ও রাসূলকে বিশ্বাস করে তবে তা একেবারেই অর্থহীন। এ জন্যই কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ - البقرة ٤٥

অর্থাৎ যারা আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় কেবল সেই শ্রেণীর লোকদের পক্ষেই নামায কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। আর যাদের কাছে নামায পড়া কঠিন কাজ বলে বিবেচিত হয়, তারা আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত নয় এটাই প্রমাণিত হয়।

তৃতীয়ত, আল্লাহর ভয়। প্রত্যেকটি মুসলমানের মনে এ ভয় সদা-সর্বদা জাগ্রত থাকা একান্ত আবশ্যক। মুসলমান ইসলাম অনুসারে কখনই কাজ করতে পারে না, যদি না তার মনে একই দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে সবসময়ই এবং সকল স্থানেই দেখছেন, তার গতিবিধি সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অবহিত। আল্লাহ অন্ধকারেও তাকে দেখছেন, নিতান্ত সংগীহীন অবস্থায়ও আল্লাহ তার সাথী, সমগ্র দুনিয়া হতে আত্মগোপন করা সম্ভব, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টি হতে লুকিয়ে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। সমগ্র দুনিয়ার সর্বপ্রকার শাস্তি ও শাসন হতে মানুষ বেঁচে যেতে পারে ; কিন্তু আল্লাহর শাস্তি ও শাসন হতে রেহাই পাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ দৃঢ় বিশ্বাসই মানুষকে আল্লাহর বিধান লংঘন করা হতে বিরত রাখে। এ বিশ্বাসের কারণেই জীবনের যাবতীয় কার্যে আল্লাহর নির্ধারিত হালাল-হারামের সীমা রক্ষা করে চলতে মানুষ বাধ্য হয়। এ বিশ্বাস যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে মুসলমান কিছুতেই খাঁটি মুসলিম জীবনযাপন করতে পারে না। এ বিশ্বাসকে বার বার স্মরণ করার জন্য এবং ক্রমাগত স্মরণের মাধ্যমে মানব মনে এ বিশ্বাস খুব দৃঢ়তার সাথে বদ্ধমূল করার জন্যই আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা নিজেই নামাযের এ স্বার্থকতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন ঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ - العنكبوت ٤٥

"নামায মানুষকে পাপ, অন্যায় ও অশ্লীলতা এবং লজ্জাহীনতার কাজ হতে বিরত রাখে।"

একথার সত্যতা আপনি নিজে চিন্তা করলেই বুঝতে পারেন ঃ আপনি যখন নামায পড়তে যান, তখন পবিত্র হয়ে এবং অযু করে যান, আপনার শরীর যদি নাপাক হয় এবং গোসল না করেই নামাযে হাজির হন, কিংবা আপনি যদি নাপাক কাপড় পরে নামায পড়তে যান, অথবা অযু না থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি

বলেন যে, আমি অযু করে এসেছি, তাহলে দুনিয়ার কোনো লোকই আপনাকে ধরতে পারে না। তবুও তা কখনই করেন না। কিন্তু কেন ? এজন্য যে, আল্লাহর দৃষ্টি হতে কোনো গোনাহ লুকানো সম্ভব নয়, একথা আপনি নিসন্দেহে বিশ্বাস করেন। এমনকি নামাযে যেসব দোআ সূরা নিশব্দে পড়তে হয়, আপনি যদি তা না পড়েন তবে তাও কেউ জানতে পারে না। কিন্তু এরূপ কাজ আপনি এজন্য করেন না যে, আল্লাহ সবকিছুই শুনতে পান, তিনি আপনার একান্ত কাছে অবস্থিত। অদ্রূপ নিবিড় জঙ্গলে গিয়েও আপনি নামায পড়েন, রাতের অন্ধকারেও নামায পড়েন, নিজের ঘরে যখন একেবারে একাকী থাকেন তখনও আপনি নামায পড়েন। অথচ এসব সময় আপনাকে কেউ দেখতে পায় না এবং কেউ জানতে পারে না যে, আপনি নামায পড়েছেন, কি পড়েননি। এর কারণ কি ? কারণ এই যে, গোপনে-সমস্ত লোক চক্ষুর আড়ালেও আল্লাহর হুকুম লংঘন করতে আপনি ভয় পান এবং আপনি নিসন্দেহে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর দৃষ্টি হতে কোনো অপরাধ গোপন করা সম্ভব নয়। এর দ্বারাই আপনি অনুমান করতে পারেন যে, নামায মানব মনে আল্লাহর ভয় কিভাবে জাগ্রত রাখে এবং আল্লাহ যে হাযের-নাযের, সর্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী, এ বিশ্বাস কিভাবে খুবই দৃঢ়তার সাথে মানব মনে বদ্ধমূল করে দেয়। বস্তুত এ ভয় এবং এ দৃঢ় বিশ্বাস আপনার মনে বদ্ধমূল ও সদাজাগ্রত না থাকলে রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টা আপনি আল্লাহর ইবাদাত ও বন্দেগী কিরূপে করতে পারেন ? আপনার মনে এ ভয় যদি না থাকে তবে রাত-দিনের অসংখ্য কাজ-কর্মে আল্লাহকে ভয় করে ন্যায় ও পুণ্যের পথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এবং সকল প্রকার পাপ ও নাফরমানী হতে দূরে থাকা আপনার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হতে পারে ?

চতুর্থত, ইবাদাত করার জন্য আল্লাহর আইন পূর্ণরূপে জেনে নেয়া আপনার পক্ষে অপরিহার্য। কারণ আইন না জানলে আপনি তা অনুসরণ করবেন কিরূপে ? নামাযই আপনার এ প্রয়োজন পূর্ণ করে। নামাযের মধ্যে কুরআন শরীফের আয়াত পাঠ করার বিধান এজন্যই দেয়া হয়েছে। এর সাহায্যে দিন-রাত আপনি আল্লাহর আইন ও বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। জুমআর নামাযের পূর্বে 'খোতবা'র নিয়মও এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, এর দ্বারা আপনি ইসলামের বিধান জানতে পারেন। জামায়াতের সাথে নামায ও জুমআর নামায পড়ার আর একটি উপকারিতা এই যে, এ উদ্দেশ্যে আলেম ও অশিক্ষিত লোকদের এক স্থানে বারবার একত্র হতে হয় এবং সকলের পক্ষেই আল্লাহর বিধান জানার অপূর্ব সুযোগ ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা নামাযে যা কিছু পড়েন তা থেকে আল্লাহর হুকুম জানতে চেষ্টা করেন না, জুমআর খোতবা এমনভাবে দেয়া হয় যে, বারবার শোনার পরও ইসলাম সম্পর্কে আপনাদের

কোনো জ্ঞান হয় না এবং জামায়াতের সাথে নামায পড়ার জন্য একত্র হওয়া সত্ত্বেও না আলেমগণ অশিক্ষিতগণকে কিছু শিক্ষা দেন, না অশিক্ষিত লোকেরা আলেমদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করেন, একে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ? নামায আপনাদেরকে এ বিষয়ে অবাধ সুযোগ করে দেয়। আপনারা যদি তা থেকে এ উপকার লাভ না করেন, তবে নামাযের অপরাধ কি ?

পঞ্চমত, জীবনের এ বিরাট কর্মক্ষেত্রে মুসলমান নিসঙ্গ থাকতে পারে না। বরং সমস্ত মুসলমানদের একত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা, মিলিতভাবে আল্লাহর বিধান পালন করা, তাঁর বিধান অনুযায়ী নিজেদের জীবন গঠন করা এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইন জারী করার জন্য একে অপরের সহযোগিতা করা তাদের অবশ্য কর্তব্য। আপনি জানেন যে, এ জীবন ক্ষেত্রে একদিকে মুসলমান—আল্লাহর আদেশানুগত বান্দাহ এবং অন্যদিকে আল্লাহদ্রোহী ও কাফের লোকদের দল রয়েছে। রাত-দিন আল্লাহর আদেশ পালন এবং আল্লাহদ্রোহিতার মধ্যে অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম চলছে। কাফেরগণ আল্লাহর আইন লংঘন করতে এবং এর বিরুদ্ধে দুনিয়ায় শয়তানের আইন জারী করছে, এদের মোকাবিলায় এক একটি 'মুসলমান' বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলে কখনও জয়লাভ করতে পারে না। তাই আল্লাহর বান্দাহদের পক্ষে একত্র হয়ে একটি মিলিত ঐক্য শক্তির বলে আল্লাহর দুশমনদের সাথে মোকাবিলা করা এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইন জারীর চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু নামায ভিন্ন আর কিছুই এ বিরাট ঐক্য শক্তি গঠন করতে পারে না। দিন-রাত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামায়াত, সাপ্তাহিক জুমআর নামাযের বড় জামায়াত, তারপর বছরে দু' ঈদের নামাযের বিরাট সম্মেলন—এসব কিছু মিলে মুসলমানদেরকে একটি সুদৃঢ় দেয়ালের মত গড়ে তোলে এবং তাদের মধ্যে চিন্তা, ভাব, মত ও কর্মের সেই ঐক্য জাগিয়ে তোলে যা মুসলমানদেরকে নিত্য নৈমত্তিক কাজে পরস্পরের সাহায্যকারী রূপে গড়ে তোলার জন্য একান্ত অপরিহার্য।

নামাযে কি পড়েন

নামায মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত, দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে চলার জন্য কিভাবে প্রস্তুত করে, তা পূর্বে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে যা কিছু লেখা হয়েছে তা পাঠ করে আপনি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, একজন মানুষ যদি আল্লাহর হুকুম এবং ফরয মনে করে রীতিমতো নামায আদায় করে, তবে সে নামাযের দোআ ও সূরাগুলোর কোনো অর্থ বুঝতে না পারলেও এ নামায তার মনে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর হাযের-নাযের হওয়ার কথা এবং তাঁর আদালতে একদিন উপস্থিত হওয়ার বিশ্বাস নিসন্দেহে সবসময়ই জাগরুক রাখবে। সবসময় সে মনে করবে যে, সে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো দাস নয়—আল্লাহই তার প্রকৃত বাদশাহ এবং প্রভু। এরই ফলে তার মধ্যে কর্তব্য পালনের অভ্যাস হবে এবং সকল অবস্থায়ই সে আল্লাহর বিধান পালন করে চলার জন্য প্রস্তুত থাকবে। মানুষের সমগ্র জীবনকে আল্লাহর বন্দেগীর অধীনে যাপন করতে এবং গোটা জীবনকে ইবাদাতে পরিণত করতে হলে যেসব গুণ-সিফাত অবশ্য প্রয়োজনীয় তাও এ নামাযের সাহায্যে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়। নামায দ্বারা এ উপকার কিরূপে লাভ করা যায় তাও আপনারা পূর্বের প্রবন্ধে ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন আশা করি।

এখন বুঝে দেখতে হবে যে, নামাযের দোআ ও সূরাগুলোর অর্থ না বুঝে নামায পড়লে যদি এতবড় উপকার লাভ করা যায়, তাহলে কেউ যদি নামায ভালভাবে বুঝে-শুনে পড়ে, সে যা পড়ছে তা যদি সে হৃদয়-মন দিয়ে বুঝতে ও অনুভব করতে পারে তবে তার বিশ্বাস, মতবাদ, চিন্তাধারা এবং অভ্যাস ও স্বভাবের কি বিরাট পরিবর্তন সাধিত হতে পারে এবং তার গোটা জীবন কিরূপ আদর্শে গঠিত হতে পারে, এখানে আমি এ বিষয়ই পুংখানুপুংখরূপে আলোচনার চেষ্টা করবো।

সর্বপ্রথম আযান সম্বন্ধে ভেবে দেখুন। দৈনিক পাঁচবার আপনাকে কি বলে ডাকা হয়? বলা হয়ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ –'আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সকলের বড়।'

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ –'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ মা'বুদ নেই। বন্দেগীর যোগ্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই।'

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ –'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।'

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ – 'নামাযের জন্য আস।'

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ – 'যে কাজে কল্যাণ ও মঙ্গল সেই কাজের দিকে আস।'

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ – 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়।'

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ – 'আল্লাহ ভিন্ন কোনো মা'বুদ নেই।'

ভেবে দেখুন, এটা কত বড় শক্তিশালী ডাক। এ ডাক প্রত্যেক দিন পাঁচবার আপনাদেরকে একথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, "পৃথিবীতে যতবড় খোদায়ীর দাবীদার দেখা যাচ্ছে, তারা সকলেই মিথ্যাবাদী, আকাশ ও পৃথিবীতে মাত্র একজনই খোদায়ী ও প্রভুত্বের অধিকারী এবং কেবল তিনি ইবাদাতের যোগ্য। আসুন আমরা সকলে মিলে তাঁরই ইবাদাত করি। ইবাদাতেই আমাদের সকলের জন্য ইহকালের ও পরকালের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত।"

এ মর্মস্পর্শী আওয়ায শুনে কে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে ? যার অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান আছে, এতবড় নির্ভীক সাক্ষ্য এবং এত স্পষ্ট আহ্বান শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা তার পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব নয় এবং প্রকৃত প্রভু-মালিকের দরবারে হাজির হয়ে তাঁর সামনে মাথা নত না করেও সে কিছুতেই থাকতে পারে না।

এ ডাক শুনেই আপনি উঠে পড়েন এবং সর্বপ্রথমেই আপনি চিন্তা করে দেখেন, আমি কি পবিত্র, না অপবিত্র ? আমার জামা-কাপড় পাক কিনা ? আমার অযু আছে কি নেই ? অন্য কথায় আপনার সুস্পষ্ট অনুভূতি থাকে যে, উভয় জাহানের বাদশাহের দরবারে হাজিরা দেয়ার বিষয়টি পৃথিবীর অন্যান্য সকল বিষয় হতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। অন্যান্য কাজ তো সকল অবস্থাতেই করা যায়, কিন্তু এ মহান দরবারে শুধু দেহ ও কাপড়-চোপড়ের পবিত্রতাই যথেষ্ট নয় অতিরিক্ত (বিশেষ) পবিত্রতাও (অর্থাৎ অযু) একান্ত অপরিহার্য। এরূপ পবিত্রতা ছাড়া এখানে হাজিরা দেয়া ভীষণ বেয়াদবী। এ অনুভূতির সাথেই আপনি প্রথমে পবিত্র হওয়ার কথা চিন্তা করেন এবং তারপরে অযু করা আরম্ভ করেন। এ অযুর সময়ে যদি আপনি প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ ধোয়ার সময় এবং অযু শেষ করার পর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিখানো দোআসমূহ পাঠ করেন এবং আল্লাহকে যথাযথরূপে স্মরণ করেন, তাহলে শুধু যে আপনার অংগ-প্রত্যংগই ধোয়া হবে তা নয়, বরং আপনার অন্তরকেও ধৌত (পবিত্র) করা হবে। অযু শেষ করার পর নিম্ন দোআ পড়তে হবে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক ও অদ্বিতীয় লা-শরীক আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ এবং রাসূল। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অবলম্বনকারী বানাও।"

এরপর আপনি নামাযের জন্য দাঁড়ান। আপনার মুখ থাকে পবিত্র কেবলার দিকে। আপনি পাক-পবিত্র হয়ে সমগ্র জাহানের বাদশাহের দরবারে হাজির হন।

সর্বপ্রথমেই আপনার মুখ থেকে বের হয় ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়।'

মনে ও মুখে এ বিরাট অঙ্গীকার উচ্চারণ করে আপনি দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস হতে নিজের সম্পর্কচ্ছেদ করার প্রতীক হিসেবে কান পর্যন্ত দু' হাত তোলেন এবং আপনার বাদশার সামনে হাত বেঁধে দণ্ডায়মান হন। এরপরে নিরতিশয় বিনয় সহকারে আপনি আরম্ভ করেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ

"হে আল্লাহ ! আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার নামের বরকত ও মাহাত্ম্য সত্যই অতুলনীয়। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, তোমার সম্মান সকলের উচ্চে। তুমি ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই।"

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ -

"অভিশপ্ত মরদুদ শয়তানের কবল হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

"মেহেরবান-দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ ○ اٰمِيْنَ -

—"সারাজাহানের পালনকর্তা মহান আল্লাহর জন্যই সমগ্র ও সর্বপ্রকার তারীফ-প্রশংসা।

—তিনি অত্যন্ত দয়াময় ও মেহেরবান।

—তিনি বিচার দিনের একমাত্র মালিক। যেদিন মানুষের যাবতীয় কর্মের বিচার করা হবে এবং প্রত্যেককে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

—হে মালিক ! আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

—আমাদেরকে সহজ, সোজা, সঠিক পথ দেখাও।

—তাদের পথ, যারা তোমার অনুগ্রহ ও পুরস্কার প্রাপ্ত।

—আর যারা অভিশপ্ত ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত নয়।

—হে আল্লাহ ! আমাদের দোআ কবুল কর, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো।

এরপর কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত পড়তে হয়। কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতই অমৃতে পরিপূর্ণ। তাতে অমূল্য উপদেশ, শিক্ষা এবং সত্য পথের দিকে আহ্বান রয়েছে। সূরা ফাতেহায় যে সহজ ও সোজা পথের জন্য দোআ করা হয়, তাতে সেই সোজা পথেরই হেদায়াত ও বিবরণ দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটি সূরার উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

"কালের শপথ ! সমগ্র মানুষ ধ্বংসের মুখে। কেবল তারা ছাড়া যারা ঈমানদার এবং (ঈমানের দাবী অনুযায়ী) সৎকর্মশীল এবং যারা পরস্পর পরস্পরকে সত্য পথে চলতে উপদেশ ও পরামর্শ দেয় এবং সত্য পথে দৃঢ় ও মযবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে (কেবল তারাই ধ্বংসের পথ হতে রক্ষা পেতে পারে)।"

এ ছোট সূরাটি হতে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, ধ্বংস ও ব্যর্থতা হতে মানুষ কেবল একটি মাত্র উপায়ে বাঁচতে পারে। তা এই যে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী আমল করাই যথেষ্ট নয়, বরং সাথে সাথে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদের এমন একটা সুসংগঠিত দলও থাকা আবশ্যক, যে দল পরস্পরকে এবং দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে সত্যের পথে—ন্যায়ের দিকে আহ্বান জানাবে এবং সর্বপ্রকার দুঃখ-বিপদে আল্লাহর দ্বীন ইসলামের ওপর সুদৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে।

কিংবা অন্য কোনো সূরা যেমন ঃ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ○ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ○ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاۤءُوْنَ ○ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ○

"হিসাব-নিকাশের দিন—কেয়ামতের প্রতি অবিশ্বাসী ব্যক্তি কি রকম হয়, তা তুমি দেখেছ কি ? এ ধরনের মানুষই এতিমকে বিতাড়িত করে এবং গরীব মিসকীনকে নিজেরা তো আহার দান করেই না—এমনকি অন্য লোকদেরকেও এ কাজে উৎসাহিত করার জন্য এতটুকু কষ্টও স্বীকার করে না। এমন সব নামাযীর জন্য ধ্বংস (পরকালের প্রতি অবিশ্বাস করার কারণে) যারা নামাযে গাফলতি করে, এরা নামায পড়লেও তা কেবল লোক দেখানোর জন্যই পড়ে এবং তাদের মন এত সংকীর্ণ যে, অতি সামান্য ও ছোট-খাটো জিনিসও অভাবীদেরকে দিতে কুণ্ঠিত হয়।"

এ সূরাটির মূল শিক্ষা এই যে, পরকালের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করা ইসলামের প্রাণ স্বরূপ। (এটা না থাকলে ইসলামের কাজই প্রাণহীন দেহের মতই অর্থহীন)। এছাড়া কোনো মানুষই আল্লাহর দেখানো সহজ সরল পথে চলতে পারে না। আর একটি সূরা ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ نِ ○ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ○ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ○ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ○ وَمَاۤ اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ ○ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ - اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ○ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ○

"অন্যের দোষ অন্বেষণ করা এবং পরকে হীন প্রতিপন্ন করে অপমানসূচক কথা বলা-ই যাদের অভ্যাস তাদের সকলের জন্য আফসোস। তারা কেবল টাকা-পয়সা জমা করে এবং (তা কি রকম বাড়ছে) বার বার গুণে দেখে। তাদের ধারণা এই যে, তাদের ধন-সম্পত্তি তাদের কাছে চিরদিন থাকবে। তা কখনই নয়। একদিন তারা নিশ্চয় মরবে এবং হুতামা নামক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি কি জান হুতামা কি ? তা আল্লাহর জ্বালানো অগ্নিকুণ্ড ; তার লেলিহান শিখা কলিজা পর্যন্ত ভষ্ম করে। তা বড় এবং সুউচ্চ স্তম্ভের ন্যায় অগ্নি শিখা যা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।"

এভাবে নামাযে কুরআন শরীফের যেসব সূরা এবং আয়াত পাঠ করা হয় তাদের মধ্যে কোনো না কোনো মূল্যবান শিক্ষা এবং উপদেশ থাকে। তা মানবকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয় যে, মানুষের প্রতি আল্লাহর এ হুকুম অনুসারে

দুনিয়াতে কাজ করতে হবে। এসব হেদায়াত ও উপদেশের আয়াত পড়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূ'তে যান। হাঁটুর ওপর হাত রেখে দুনিয়া জাহানের আল্লাহ তাআলার সামনে মাথা নত করে বারবার বলতে থাকেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ "অতি পবিত্র আমার মহান পালনকর্তা পরওয়ারদেগার।" তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং বলেন ঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলো, তার কথা আল্লাহ শুনতে পেয়েছেন।" এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে মাটির সাথে মাথা মিশিয়ে সেজদা করেন এবং বলেন ঃ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى "আমি মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।"

তা পড়ে মাথা উঠান এবং আদবের সাথে বসে পাঠ করেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ - اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

—"আমাদের সব সালাম-শ্রদ্ধা, আমাদের সব নামায এবং সকল প্রকার পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে।

—হে নবী ! আপনার প্রতি সালাম, আপনার ওপর আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

—আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাহদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ প্রভু ও মা'বুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দাহ এবং রাসূল।"

এভাবে আপনি যখন সাক্ষ্য দেন তখন আপনাকে শাহাদাত আঙ্গুল ওঠাতে হয়। কেননা এ অঙ্গুলি সংকেত দ্বারা নামাযের মধ্যেই আপনার আকীদা ও বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করা হয় এবং এ সাক্ষ্যের কথাটি মুখে বলার সময় বিশেষভাবে মনোযোগ স্থাপন করতে এবং মন-মগযের ওপর বিশেষ জোর দিতে হয়। এরপর আপনাকে নিম্নের দরূদ পাঠ করতে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

"হে আল্লাহ ! দয়া ও রহমত কর আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি, যেমন তুমি রহমত করেছো হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি অতি উত্তম গুণের আধার এবং মহান। হে আল্লাহ ! বরকত নাযিল কর আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বংশধরদের ওপর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর বংশধরদের ওপরে করেছো। নিশ্চয়ই তুমি অতীব সৎগুণ বিশিষ্ট ও মহান।"

দরূদ পড়ার পরে আল্লাহর কাছে এভাবে দোআ করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ -

"হে আল্লাহ ! আমি জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচার জন্য তোমার কাছে আশ্রয় চাই। কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। সেই পথভ্রষ্টকারী দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, যে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। তোমার কাছে আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ ! অন্যায় কাজ এবং ঋণ থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"

এ দোআ পাঠ করার পর নামায পূর্ণ হয়ে যায়। রাব্বুল আলামীনের দরবার থেকে বিদায় নিয়ে সর্বপ্রথম ডান ও বাম দিকে ফিরে উপস্থিত সকলের এবং দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য রহমত ও শান্তি প্রার্থনা করে বলেন ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ "আপনাদের প্রতি আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।" এটা যেন একটি শুভ সংবাদ ; নামাযের পর আল্লাহর দরবার থেকে এটা নিয়েই আপনি ফিরে এসেছেন। এভাবেই নামায আদায়

করেন অতি ভোরে উঠে দুনিয়ার সব কাজ-কর্ম শুরু করার পূর্বেই। তারপর অনেক ঘন্টা যাবত দুনিয়ার নানা কাজে লিপ্ত থাকেন। দ্বিপ্রহরের একটু পরেই আবার আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে নামায আদায় করেন—তার কয়েক ঘন্টা পরেই বেলা তৃতীয় প্রহরেও আবার এ নামায আদায় করেন। আবার কয়েক ঘন্টা কাজ-কর্ম করার পর সূর্যাস্ত হলেই আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে এ নামায আদায় করেন। তারপর দুনিয়ার কাজ-কর্ম শেষ হয়ে গেলে ঘুমাবার পূর্বে শেষবারের মত আল্লাহর সামনে হাজির হন। এ শেষ নামাযের শেষ তিন রাকআতের নাম 'বেতেরের নামায'। এর তৃতীয় রাকআতে আল্লাহর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন। এ প্রতিজ্ঞার নাম 'দোআয়ে কুনুত'। এ দোআর মারফতে নামাযী আল্লাহর সামনে অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্রতার সাথে তাঁর আনুগত্য ও দাসত্বের শপথ গ্রহণ করে। তাঁর অনুগত হয়ে চলার ওয়াদা করে। এ প্রতিজ্ঞায় আপনি কি বলেন মনোযোগ সহকারে শুনুন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ - وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ -

"হে আল্লাহ ! আমরা তোমার কাছে সাহায্য চাই। তোমার কাছে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। তোমার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি। আমরা কেবলমাত্র তোমার ওপরেই ভরসা করি। সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের সাথে তোমার প্রশংসা করি। আমরা তোমার শোকর আদায় করি, তোমার দানকে অস্বীকার করি না। আমরা তোমার কাছে ওয়াদা করছি যে, তোমার অবাধ্য লোকদের সাথে আমরা কোনো সম্পর্ক রাখবো না—তাদেরকে পরিত্যাগ করবো। হে আল্লাহ ! আমরা তোমারই দাসত্ব স্বীকার করি। কেবলমাত্র তোমার জন্যই নামায পড়ি, কেবল তোমাকেই সিজদা করি এবং আমাদের সকল প্রকার চেষ্টা-সাধনা ও সকল কষ্ট স্বীকার কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যই। কষ্ট আমরা কেবল তোমারই রহমত লাভের আশায় করি, তোমার আযাবকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাবে কেবল কাফেরগণই নিক্ষিপ্ত হবে।"

একটু ভেবে দেখুন, যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার আযানের ধ্বনি শুনে এবং চিন্তা করে দেখে যে, কত বড় কথা সেই আযানেই ঘোষণা করা হচ্ছে এবং তা

দ্বারা কত বড় মহান বাদশাহর কাছে হাজির হবার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। প্রতিবার আযান শুনে যে ব্যক্তি তা মনে মনে অনুভব করে নিজের সকল কাজ-কর্ম ছেড়ে সারাজাহানের মালিক ও প্রভুর দরবারে হাজির হয়, প্রতি নামাযের পূর্বে অযু করে নিজের দেহ ও মনকে পবিত্র করে নেয় এবং বারবার নামাযে উল্লেখিত রূপে সূরা ও দোয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করে প্রকৃতপক্ষে তার হৃদয়-মনে আল্লাহর ভয় না জেগে পারে না। আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে তার লজ্জা না হয়ে পারে না। পাপ ও অন্যায় কাজের কালো চিহ্ন নিয়ে আল্লাহর দরবারে বারবার হাজির হতে তার অন্তরাত্মা নিশ্চয় কেঁপে ওঠবে। নামাযে আল্লাহর দাসত্ব এবং তাঁর আনুগত্য করে চলার কথা বলা এবং আল্লাহকে বিচার দিনের মালিক বলে বারবার স্বীকার করার পর কোন মানুষ বাহির দুনিয়ায় নিজের কাজ-কর্মের মধ্যে ফিরে এসে মিথ্যা কথা বলা, বেঈমানী করা, পরের হক আত্মসাৎ করা, ঘুষ খাওয়া ও দেয়া, সুদ খাওয়া ও দেয়া, অন্য মানুষকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া, নির্লজ্জতা, ব্যভিচার ও অন্যায় প্রভৃতি কাজ কিছুই করতে পারে না কিংবা এগুলো করার পর পুনরায় আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে এসব কথা মুখে স্বীকার করার দুঃসাহস করতে পারে না। আপনি জেনে বুঝে দৈনিক অসংখ্যবার আল্লাহর সামনে স্বীকার করেন, "হে আল্লাহ ! আমি কেবল তোমার দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।" এটা স্বীকার করে আপনার পক্ষে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করা এবং অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা কেমন করে সম্ভব হতে পারে ? একবার এসব স্বীকার করে তার বিরোধিতা করলে পুনরায় আল্লাহর সামনে হাজির হতে আপনার মন আপনাকে তিরস্কার করবে, লজ্জায় আপনার মাথা নত হয়ে পড়বে। আবার বিরোধিতা করলে আরো বেশী লজ্জা হবে এবং বিবেক আপনাকে আরো বেশী দংশন করবে। সমস্ত জীবন ভরে দৈনিক পাঁচবার নামায পড়া সত্ত্বেও আপনার কাজ-কর্ম ও চরিত্র ঠিক না হওয়া এবং আপনার জীবনের আমূল পরিবর্তন সূচিত না হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা নামাযের এ সুফল দান প্রসংগে বলেছেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ -

"নিশ্চয়ই নামায মানুষকে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা ও সর্বপ্রকার পাপকার্য হতে বিরত রাখে।"

কিন্তু মানুষের মন ও চরিত্র সংশোধন করার এতবড় উপায় থাকা সত্ত্বেও এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া সত্ত্বেও যদি কারো চরিত্র ঠিক না হয়, যদি কেউ পাপ পথ থেকে বিরত না থাকে তবে বুঝতে হবে যে, আসলে তারই স্বভাব

খারাপ। সে জন্য নামাযের কোনো ক্রটি নেই। পানি ও সাবান কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে বটে ; কিন্তু তাতে কয়লার ময়লা দূর না হলে সে জন্য পানি ও সাবানের কোনো দোষ দেয়া যায় না—দোষ কয়লারই হবে।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা নামাযে যা কিছু পড়ি তা মোটেই বুঝি না বা বুঝেও পড়ি না। আমাদের নামাযে এটা একটি অতি বড় অভাব। এটা শেখার জন্য কিছু সময় ব্যয় করলেই অভাব পূরণ হতে পারে—নিজেদের মাতৃভাষায় নামাযের সব দোআ ও সূরাগুলোর অর্থ ও ভাব অনায়াসেই আপনারা শিখতে পারেন। আমি মনে করি, এতে আপনাদের বড়ই উপকার হবে।

জামায়াতের সাথে নামায

আগের প্রবন্ধগুলোতে আমি শুধু নামাযের বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতার কথাই বলেছি। তা দ্বারা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, এটা কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এ নামায মানুষের মধ্যে জীবন ব্যাপী বন্দেগীর ভাবধারা কেমন করে জন্মায় এবং কেমন করে তাকে এ বন্দেগীর হক আদায়ের যোগ্য করে তোলে—সে কথাও আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এক্ষণে আমি জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের উপকারিতার কথা আপনাদেরকে বলবো। তা দ্বারা আপনারা খুব ভাল করে বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ্ দয়া ও অনুগ্রহ করে এ একই জিনিসের মধ্যে সবরকমের নিয়ামত কিভাবে জমা করে রেখেছেন। শুধু নামাযই আমাদের পক্ষে কম ছিল না ; কিন্তু সেই সাথে জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের আদেশ করে আল্লাহ্ পাক এটাকে দ্বিগুণ উপকারিতার ভাণ্ডার করে দিয়েছেন এবং তাতে এমন এক অপূর্ব শক্তি দান করেছেন, যা মানুষের মধ্যে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি করতে অতুলনীয়।

পূর্বেই বলেছি, জীবনের সর্বক্ষণ নিজেকে আল্লাহর বান্দাহ বলে মনে করা, অনুগত গোলামের ন্যায় মালিকের অধীন হয়ে থাকা এবং মালিকের হুকুম পালনের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকার নামই হচ্ছে ইবাদাত, আর নামায মানুষকে এ ইবাদাতের জন্যই প্রস্তুত করে। এরূপ ইবাদাতের জন্য মানুষের মধ্যে যতগুলো গুণের দরকার, নামায তার সবই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। দাস হওয়ার অনুভূতি, আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর কিতাবের প্রতি ঈমান, পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহভীতি, আল্লাহকে 'আলেমুল গায়েব' বলে স্বীকার করা, তাকে সবসময়ই নিজের কাছে অনুভব করা, আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য সর্বদা নিজেকে প্রস্তুত রাখা, আল্লাহর হুকুমগুলো ভাল করে জানা—নামায এসব এবং এ ধরনের বহু গুণই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে এবং তাকে আল্লাহ্ তাআলার খাঁটি বান্দাহরূপে গড়ে তোলে।

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারেন যে, মানুষ নিজে যতই গুণসম্পন্ন হোক না কেন, অন্যান্য মানুষ যতক্ষণ তাঁর সহযোগী ও সাহায্যকারী না হবে ততক্ষণ সে আল্লাহর বন্দেগীর 'হক' পূর্ণরূপে আদায় করতে পারবে না। মানুষ যাদের সাথে দিন-রাত জীবন যাপন করে, সবসময় যাদের সাথে একত্রে কাজ করে, আল্লাহর ফরমাবরদারী করার ব্যাপারে তারা যদি সহযোগিতা না করে, তবে সে কিছুতেই আল্লাহর হুকুম পালনে সমর্থ হয় না।

মানুষ দুনিয়ায় একাকী আসেনি। একাকী থেকে সে কিছু করতেও পারে না। সে পাড়া-প্রতিবেশী ও সহকর্মী এবং জীবন পথের সঙ্গী-সাথীদের সাথে নানাভাবে জড়িত। আল্লাহর হুকুম আহকামও কোনো নিসঙ্গ একটি মানুষের জন্য নয়, বরং সকল মানুষের জন্যে—জীবনের সকল প্রকার সম্পর্ক সম্বন্ধ সঠিকভাবে বজায় রাখার জন্যই তা আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। এখন আল্লাহর হুকুম পালন করার ব্যাপারে যদি সবাই পরস্পরকে সাহায্য করে, সহযোগিতা করে, তবেই তারা এক সাথে আল্লাহর হুকুম পালনকারী হতে পারে। পক্ষান্তরে সকলে মিলে যদি আল্লাহর নাফরমানী শুরু করে কিংবা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যদি এমন হয় যে, আল্লাহর আদেশ পালনে পরস্পর সহযোগিতা না করে, তবে একজন লোকের পক্ষে সঠিকভাবে নিয়মিত আল্লাহর হুকুম পালন করা এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে কাজ করা একেবারেই অসম্ভব।

আপনারা যদি বিশেষ লক্ষ্যের সাথে কুরআন পাঠ করেন, তাহলে জানতে পারবেন যে, আল্লাহ তাআলা কেবল আপনাকেই আল্লাহর অধীন ও অনুগত হতে এবং আল্লাহর হুকুম পালন করে চলতে বলেননি। বরং সেই সাথে আপনাকে এ আদেশও দেয়া হয়েছে, আপনি সমগ্র দুনিয়াকে আল্লাহর অধীন ও অনুগত করে দিবেন, দুনিয়াতে আল্লাহর আইন জারী করবেন। দুনিয়ার যেখানে যেখানে 'শয়তানের' আইন চলছে, তা বন্ধ করবেন এবং সে স্থানে এক ও লা-শরীক আল্লাহ তাআলার আইনের হুকুমাত কায়েম করবেন। আপনার প্রতি আল্লাহ এই যে বিরাট খেদমতের আদেশ দিয়েছেন একজন লোকের পক্ষে এ কাজ সমাধা করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। এ মতে বিশ্বাসী কোটি কোটি মুসলামনও যদি হয় আর তারা বিভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে—তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ বা সম্পর্ক না থাকে তবে তারাও 'শয়তানের' সুশৃংখলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তিকে কিছুতেই পরাজিত করতে পারবে না। এজন্যই মুসলমানদের দলবদ্ধ হওয়া ও পরস্পরকে সাহায্য করা, একে অন্যের পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক হয়ে দাঁড়ান এবং সকলে মিলে একই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম-সাধনা করা অপরিহার্য।

একটু গভীরভাবে দেখলে একথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এতবড় বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুসলমানদের কেবল মিলিত ও একতাবদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয়। তাদের মিলিত হতে হবে ঠিক পন্থা অনুসারে অর্থাৎ এমনভাবে মুসলমানদের একটি জামায়াত গঠন করতে হবে, যেন তাদের পরস্পরের সাথে সঠিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়—তাদের পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে যেন কোনোরূপ দোষ-ত্রুটি না থাকে। তাদের মত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মনীতির পূর্ণ ঐক্য বর্তমান থাকা চাই। তাদের একজন আমীর ও নেতা হওয়া দরকার, তাদের

মধ্যে সেই নেতার ইশারা অনুসারে কাজ করার অভ্যাস ও স্পৃহা থাকা চাই। তাদেরকে নেতার হুকুম পালন করতে হবে আর তা কতদূরইবা করতে হবে এবং কোন্ কারণ ঘটলে নেতার বিরোধিতাও করা যেতে পারে—তাও তাদের ভাল করে বুঝে নেয়া আবশ্যক। একথাগুলো মনে রাখুন এবং জামায়াতের সাথে নামায পড়লে এসব গুরুত্বপূর্ণ ভাবধারা নামাযীদের মধ্যে কেমন করে জেগে উঠে তা চিন্তা করে দেখুন।

আযান শোনা মাত্রই সব কাজ-কর্ম ছেড়ে মসজিদের দিকে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। কাজেই আযানের সাথে সাথেই মুসলমানদের নিজ নিজ কাজ ত্যাগ করা এবং একই কেন্দ্রের (মসজিদ) দিকে সকলের অগ্রসর হওয়া একটি বিরাট সৈন্যবাহিনীর কথা স্বরণ করিয়ে দেয়। সৈন্য শিবিরে 'বিউগলের' আওয়ায হওয়ার সাথে সাথেই প্রত্যেকটি সৈনিক বুঝতে পারে যে, সেনাপতি সকলকে ডাকছেন। এ সময় সকলের মনে একই ভাব উদয় হয়। সেই ভাব হচ্ছে সেনাপতির নির্দেশ পালনের কর্তব্য ও দায়িত্ব। একথা মনে হওয়ার সাথে সাথে সকলে একই কাজ করে, অর্থাৎ যে যেখানে আছে সেখান হতে সে আওয়ায শোনা মাত্রই নির্দিষ্ট স্থানের দিকে দৌঁড়াতে থাকে। সৈন্যদের জন্য এ পন্থা কেন গ্রহণ করা হয়েছে ? প্রথম এজন্য যেন আলাদাভাবে প্রত্যেকটি সৈনিকের মধ্যে হুকুম পালন করার এবং হুকুম পালনের জন্য সবসময়ই প্রস্তুত থাকার অভ্যাস হবে। দ্বিতীয়ত, সেই সাথে এ ধরনের সকল অনুগত সিপাহীদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠিত হবে এবং সেনাপতির আদেশে একই সময় একই স্থানে সমবেত হওয়ার অভ্যাস হবে। এ অভ্যাসটি এজন্য দরকার যে, হঠাৎ কোনো ঘটনা যদি দেখা দেয় তখন যেন সকল সিপাহী একই আওয়াযে একই স্থানে হাজির হয়ে কাজ করতে পারে। প্রত্যেক সৈনিক ব্যক্তিগতভাবে যদি খুব বড় বাহাদুর হয়, কিন্তু কাজের সময় ডাকলে অবিলম্বে উপস্থিত হয়ে যদি লড়াই করতে না পারে, তাহলে তাদের বাহাদুরীর কোনো মূল্যই থাকে না। ডাক দেয়া মাত্র সৈন্যগণ যদি একত্র না হয় বরং নিজ নিজ ইচ্ছামত এক এক দিকে চলে যায়, তবে এ ধরনের হাজার বীর সৈনিককে শত্রুপক্ষের পঞ্চাশটি সৈনিকের একটি শৃংখলাবদ্ধ দল নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে।

ঠিক এ নিয়মেই আযান শুনা মাত্রই কাজ-কর্ম ছেড়ে নিকটস্থ মসজিদে হাজির হবার জন্য মুসলমানকে আদেশ করা হয়েছে যেন সব মুসলমান মিলে আল্লাহর একটি সৈন্যদলে পরিণত হতে পারে। এভাবে দৈনিক পাঁচবার আযান শুনামাত্র হাজির হওয়ার অভ্যাস করানো হয় এজন্য যে; দুনিয়ার সকল প্রকার সৈনিকের তুলনায় এ খোদায়ী সেনাদের কর্তব্য অনেক বেশী, অনেক কঠোর। অন্যান্য ফৌজের পক্ষে বহুকাল পরে হয়ত যুদ্ধ করার প্রয়োজন পড়ে এবং করে

কোন্ সময় যুদ্ধ বাঁধবে সে জন্য বহু পূর্ব থেকেই এত সব ট্রেনিং দেয়া হয়। কিন্তু এ খোদায়ী ফৌজকে প্রত্যেক মুহূর্তেই শয়তানী শক্তির সাথে লড়াই করতে হয় এবং প্রত্যেকটি মুহূর্তেই সেনাপতির আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এজন্য মুসলমানদের দিন-রাতের মধ্যে পাঁচবার খোদায়ী 'বিউগল'—আযানের আওয়াযে আল্লাহর শিবির অর্থাৎ মসজিদের দিকে ছুটতে হয়, বলতে হবে যে, দায়িত্ব ও কর্তব্যের তুলনায় তাদের প্রতি এটাকে অনেক অনুগ্রহ করা হয়েছে সন্দেহ নেই।

এ যাবত শুধু আযানের সৌন্দর্য ও সার্থকতার কথাই আলোচনা করা হয়েছে। আযান শুনে সকল মুসলমান মসজিদে হাজির হয়। কেবল এ জমায়েত হওয়ার মধ্যেই অনেক সৌন্দর্য-সার্থকতা নিহিত রয়েছে। এখানে মিলিত হয়ে মুসলমানগণ পরস্পরকে দেখতে পান, চিনতে ও পরিচয় লাভ করতে পারেন।

কিন্তু আপনারা পরস্পরের সাথে এই যে মিলিত ও পরিচিত হন, তা কোন্ সূত্রে ? এ সূত্রে যে, আপনারা এক আল্লাহ তাআলার বান্দাহ, এক রাসূলের অনুসরণকারী, এক কুরআন শরীফই আপনাদের সকলেরই কিতাব—জীবন বিধান এবং আপনাদের সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য এক। সেই একই উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য আপনারা মসজিদে একত্র হয়েছেন এবং এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পরও আপনারা প্রত্যেকেই সে একই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চেষ্টা করবেন ; বস্তুত এ ধরনের পরিচয় এবং এরূপ সাহচর্য স্বাভাবিকভাবে আপনাদের মনে এ খেয়াল জাগিয়ে দেয় যে, আপনারা সকলেই একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত, একই ফৌজের সিপাহী আপনারা। আপনারা একে অপরের ভাই। দুনিয়ায় আপনাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক, আপনাদের লাভ-লোকসানে সকলেই আপনারা শরীক ও আপনাদের পরস্পরের জীবন একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।

আপনারা যখন পরস্পরের দিকে তাকাবেন তখন ঠিক চোখ-মন অন্তর খুলে উদার দৃষ্টিতে তাকাবেন। শত্রু যে দৃষ্টিতে শত্রুকে দেখে থাকে আপনারা কারো প্রতি সেভাবে তাকান না বরং বন্ধু যেরূপ বন্ধুর দিকে তাকায়, ভাই যে চোখে ভাইয়ের দিকে তাকায় ঠিক সেই দৃষ্টিতেই একজন অপরজনের প্রতি তাকিয়ে থাকেন। এভাবে তাকাবার ফলে আপনি যখন কোনো ভাইকে পুরাতন ও ছেড়া কাপড় পরিহিত দেখতে পাবেন, কাউকে বিশেষ চিন্তিত বিপদগ্রস্ত বা ক্ষুধার্ত দেখবেন, কাউকে দেখবেন অক্ষম-পংগু, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও অন্ধ তখন আপনার অন্তরে আপনা আপনিই সহানুভূতি ও দয়ার উদ্রেক হবে। আপনারা ধনী লোকেরা গরীব ও অসহায় দুঃস্থদের দুঃখ অনুভব করবেন, ফকীর-মিসকীন

লোকেরা ধনীদের কাছে পৌছে নিজেদের দুরবস্থার কথা বলার সাহস পাবে। কারো সম্পর্কে যদি আপনি জানতে পারেন যে, সে অসুস্থ কিংবা বিপদগ্রস্ত বলে মসজিদে আসতে পারেনি তখন তাকে দেখতে যাবার জন্য আপনার মনে আগ্রহ হবে। কারো মৃত্যু সংবাদ পেলে জানাযা পড়তে যেতে পারেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে পারেন। বস্তুত এ কাজই আপনাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করবে।

আর একটু ভেবে দেখুন—আপনারা যেখানে একত্র হন তা একটি পাক-পবিত্র স্থান। এ পাক স্থানে মহান উদ্দেশ্যে নিয়ে আপনারা একত্র হয়ে থাকেন। চোর-ডাকাত, শরাবী আর জুয়াড়ী দলও এক স্থানে একত্র হয় বটে ; কিন্তু তাদের সকলের মন অসৎ ইচ্ছায় পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু আপনাদের সমবেত হওয়াকে এদের সাথে তুলনা করা যায় না। কারণ এখানে আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণই একত্র হয়ে থাকেন—আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আপনাদের এ সম্মেলন আল্লাহর ঘরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আল্লাহর সামনে বন্দেগী ও দাসত্বের কথা খালেছ মনে স্বীকার করার জন্যই এখানে সকলে সমবেত হন। এমতস্থানে ঈমানদার লোকদের মনে আপনা আপনি নিজ নিজ গুনাহের জন্য লজ্জার অনুভূতি জেগে উঠে। অন্য দিকে যদি কোনো মানুষ অন্য কারো সামনে কোনো গুনাহের কাজ করে থাকে, আর সেই ব্যক্তি যদি মসজিদে হাজির হয়, তাহলে কেবল এতেই গুনাহগার ব্যক্তি লজ্জায় মরে যায়। উপরন্তু মুসলমানদের মনে পরস্পরকে উপদেশ দেয়ার ভাবও যদি বর্তমান থাকে এবং সে যদি দরদ, ভালবাসা ও সহানুভূতির সাথে একজনের দোষক্রটি কেমন করে দূর করা যায়, তা ভাল করে জেনে নেয়, তবে তাদের এ সম্মেলনের প্রতি আল্লাহর অশেষ রহমত ও বরকত নাযিল হবে—তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এভাবে জামায়াতে নামায পড়ার সুযোগে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের দোষ-ক্রটি সংশোধন করতে পারবেন—একজন অন্যজনের অভাব পূরণ করবেন। ফলে ধীরে ধীরে গোটা সমাজই সৎ ও নেককার হতে পারবে।

মসজিদে কেবল মিলিত হওয়ার মধ্যেই এ বিরাট বরকত রয়েছে। এরপর জামায়াতের সাথে নামায পড়ার উপকারিতা ও বরকত যে কত অসীম তাও ভেবে দেখুন। নামাযীগণ সকলে একই সারিতে সমানভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাদের কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়, কেউ উচ্চ নয়, কেউ নীচু নয়—আল্লাহর দরবারে, আল্লাহর সামনে সকল মানুষ একেবারে সমান। কারো হাত লাগলে বা কারো স্পর্শ লাগলে তাদের কেউ নাপাক হয়ে যায় না। এখানে অস্পৃশ্যতার কোনো অবকাশ নেই। তাদের সকলেই পাক এবং পবিত্র ; কারণ এরা সকলেই মানুষ, সকলেই এক আল্লাহর বান্দাহ ; একই দ্বীন ইসলামের অনুগামী। এ

নামাযীদের মধ্যে বংশ, পরিবার, গোত্র, দেশ আর ভাষায় আদৌ কোনো পার্থক্য নেই। ব্যক্তিগতভাবে এদের কেউ সাইয়েদ, কেউ পাঠান, কেউ খাঁ সাহেব, কেউ হাওলাদার আর কেউ চৌধুরী সাহেবও হতে পারেন। আবার এদের একজন হয়ত এক দেশের অধিবাসী আর একজন অন্য দেশের অধিবাসী। কেউ এক ভাষায় কথা বলে, কেউ অন্য ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এসব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা সকলে একই সারিতে দাঁড়িয়ে মিলিতভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে। এর অর্থ এই যে, তারা সকলেই এক জাতির লোক। এখানে বংশ-গোত্র, দেশ-অঞ্চল ও জাতীয়তার প্রভেদ পার্থক্য একেবারে মিথ্যে। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগী, আল্লাহর ইবাদাত। এ ব্যাপারে আপনারা সকলেই যখন এক তখন অন্যান্য ব্যাপারেও আপনাদের ভিন্ন ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনোই কারণ থাকতে পারে না।

আপনারা যখন সারি বেঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ান, তখন মনে হয় যেন একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী বাদশাহের সামনে কর্তব্য পালনের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। কাতার বেঁধে দাঁড়ানোর এবং একত্রে মিলে ওঠাবসা করায় নামাযীদের মনে পরম ঐক্যভাবের সৃষ্টি হয়। এভাবে নামাযের ভিতর দিয়ে সকলকে আল্লাহর বন্দেগী করার অভ্যাস করানো হয়—তাদের সকলের হাত একত্রে ওঠবে, সকলের পা এক সাথে চলবে। তাতে পরিষ্কার মনে হবে যে, নামাযীরা বিশজন বিশজন কিংবা একশজন নয়—তারা একত্রে মিলে একটি অখণ্ড মানুষে পরিণত হয়েছে।

জামায়াত ও কাতারবন্দী হওয়ার পরে কি করা হয় ? সকল নামাযী একই ভাষায় আল্লাহর সামনে একই আরয জানায় ঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ "হে আল্লাহ ! আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।" اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ "হে আল্লাহ ! আমাদেরকে সহজ সঠিক পথ দেখাও।" رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ "হে আল্লাহ ! সব তারীফ প্রশংসা কেবল তোমারই জন্য।" اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ। "আমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপরও।" তারপরে নামায শেষ করে একে অপরকে এ বলে সালাম করে اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ –এর অর্থ এই যে, নামাযীদের প্রত্যেকেই পরস্পর কল্যাণকামী এবং সকলে মিলে একই মালিকের কাছে সকলের মঙ্গল দাবী করছে। কোনো নামাযী একাকী নয়, তাদের কেউই কেবলমাত্রই নিজের

জন্য কল্যাণ কামনা করে না। বরং সকলের মুখে এ দোআ যে, হে আল্লাহ ! আমাদের সকলেরই প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও কল্যাণ বর্ষিত হোক, সকলকে একই সহজ ও সোজা পথে চলার তৌফিক দাও, সকলের ওপরেই শান্তি বর্ষিত হোক। নামায এভাবে সকল নামাযীর দিলকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দেয়, সকলের মনে একই খেয়াল ও একই চিন্তাধারা জাগরিত করে, তাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা, ঐক্য ও মংগলাকাংখার সৃষ্টি হয়।

কিন্তু মনে রাখবেন, জামায়াতের সাথে নামায ইমাম ছাড়া পড়া যায় না। দু'জন মিলে পড়লেও তাদের মধ্যে একজনকে ইমাম ও অপরজনকে মোকতাদী হতে হয়। জামায়াত শুরু হলে তা থেকে আলাদা হয়ে একাকী নামায পড়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বরং হুকুম রয়েছে যে, জামায়াত আরম্ভ হওয়ার পর যেই আসবে, তাকে সেই ইমামের পিছনেই (একেতেদা করে) দাঁড়াতে হবে। এসব কাজ কেবল নামাযের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আসলে এটা দ্বারা একটি বড় শিক্ষা এই দেয়া হচ্ছে যে, মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে এভাবে জামায়াতবন্দী হয়ে থাকতে হবে। আর আপনাদের মধ্যে একজন যদি ইমাম না হয় তাহলে আপনাদের সেই জামায়াত গঠনই হতে পারে না। জামায়াত গঠন হওয়ার পরেও তা থেকে আলাদা হয়ে থাকলে আপনাদের জীবন মোটেই ইস-লামী জীবন নয়। মুসলিম জীবনের সাথে এর আদৌ সম্পর্ক নেই।

এখানেই শেষ নয়। জামায়াতের সাথে নামায পড়ার মাধ্যমে ইমাম ও মোকতাদীদের মধ্যে একটা বিরাট মযবুত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়—যার সাহায্যে প্রত্যেকটি মুসলমানই জানতে পারে যে, এ ছোট্ট মসজিদের বাইরে পৃথিবী নামক বিরাট মসজিদে 'ইমামের' মর্যাদা কি ? তাঁর কর্তব্য কি ? তাঁর কি কি 'হক' আছে ? সেই 'বড় মসজিদের' ইমামের অনুসরণ আপনাকে কিভাবে করতে হবে, সে ভুল করলে আপনি কি করবেন ? তার ভুলকে আপনি কতক্ষণ বরদাশত করবেন ? কখন আপনি তার ভুল ধরতে পারবেন ? আর তা শোধরাবার দাবী করতে পারবেন ? আর কোন অবস্থায় ইমামকে পদচ্যুত করতে পারবেন ? এ সমস্ত কথা ছোটখাটোভাবে প্রত্যেক মুসলিমকে মসজিদের মধ্যে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। এক কথায় মসজিদে একটি ছোটখাট রাজ্য চালাবার নিয়ম-কানুন দৈনিক পাঁচবার শিক্ষা দেয়া হয় এবং তার অভ্যাস করানো হয়।

একথাগুলো বিস্তারিতভাবে বলার অবকাশ এখানে নেই। সংক্ষেপে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলে রাখছি।

শরীয়াতের আদেশ এই যে, সমাজের লোকদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী পরহেযগার হবে, ইলম যার বেশী হবে, কুরআন শরীফ যে সকলের অপেক্ষা ভাল করে পড়তে ও বুঝতে পারবে এবং সেই সাথে যার উপযুক্ত বয়স হয়েছে, ঠিক তাকেই নামাযের ইমাম বানাতে হবে। কর্মক্ষেত্রে যারা জাতির নেতা হবে তাদের মধ্যে কি কি গুণ থাকা অবশ্য দরকার—উক্ত ব্যবস্থা দ্বারা পরিষ্কারভাবে তারই শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

শরীয়াত আদেশ করেছে যে, জামায়াতের অধিকাংশ লোক যাকে ইমাম বানাতে রাজী নয়, তাকে ইমাম নিযুক্ত করা অনুচিত। অল্পসংখ্যক লোকের অসম্মতি ধর্তব্য নয়, কারণ তা হয় না এমন লোক কখনো পাওয়া যায় না। কিন্তু জামায়াতের অধিকাংশ লোক যদি কোনো ব্যক্তিকে অপসন্দ করে, তবে তাকে কিছুতেই ইমাম নিযুক্ত করা যেতে পারে না। এর দ্বারা জাতির ইমাম বা নেতা নির্বাচন করার নিয়ম শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

শরীয়াতে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, নামাযের ইমাম এমন ব্যক্তিকে বানাতে হবে, যে সকল নামাযীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামায পড়বে। কারণ নামাযীদের মধ্যে অনেক রুগ্ন, বৃদ্ধ, অসুস্থ আর দুর্বল লোকও থাকতে পারে। এমতাবস্থায় কেবল যুবক, শক্তিমান আর অবসর বিশিষ্ট মানুষদের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযে লম্বা লম্বা কেরাত পড়লে এবং লম্বা লম্বা রুকূ'-সেজদা করতে থাকলে অন্যের পক্ষে অনেক কষ্ট ও অসুবিধা হতে পারে। তাই ইমামের মনে রাখতে হবে যে, নামাযীদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধ আছে, রুগ্ন ও দুর্বল ব্যক্তি আছে এবং এমন অনেক লোক আছে যারা তাড়াতাড়ি নামায পড়ে নিজ নিজ কাজে ফিরে যেতে চায়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে অনেক সহানুভূতি দেখিয়েছেন। নামায পড়াবার সময় কোনো শিশুর কান্নার আওয়ায শুনতে পেলেও তিনি নামায অনেক সংক্ষেপ করতেন। কারণ শিশুর মাতা (কিংবা পিতা) এ জামায়াতে শরীক থাকলে তার মনে কষ্ট হতে পারে—তাই নামাযের ব্যাঘাত হতে পারে। এ নিয়ম দ্বারা জাতির নেতৃবৃন্দকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তাকে যখন 'নেতা' বানান হয়েছে, তখন প্রত্যেক কাজেই জাতির সকল প্রকার লোকের প্রতি তার লক্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। শরীয়াতের ব্যবস্থা এই যে, নামায পড়াবার সময় ইমামের যদি এমন কোনো অবস্থা হয়, যাতে সে আর নামায পড়াতে পারছে না, তাহলে অবিলম্বে তার সরে গিয়ে অন্য এক ব্যক্তিকে ইমাম করে দেয়া আবশ্যক। এ থেকে এ নির্দেশ পাওয়া যায় যে, জাতির নেতা যখন নিজ কর্তব্য পালনে অক্ষম হবে, তখন সে নিজেই পদত্যাগ করে অন্য কোনো উপযুক্ত লোককে সেখানে নিযুক্ত করার

ব্যবস্থা করবে। এটা করা তার পক্ষে ফরয। এ কাজে তার কোনো লজ্জা হওয়া উচিত নয়, এতে স্বার্থপরতাও নেই।

শরীয়াতের আদেশ এই যে, ইমাম যা করবে মোকতাদীগণও তার অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে। ইমামের কোনো কাজ করার আগে মোকতাদীর তা করা একেবারে নিষিদ্ধ। এমনকি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ইমামের আগে কেউ রুকূ' বা সিজদা করলে কিয়ামতের দিন তাকে গাধা বানিয়ে ওঠানো হবে।" নেতাকে কিভাবে অনুসরণ করে চলা অবশ্য কর্তব্য এখানে মুসলিম জাতিকে তাই শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

নামাযের মধ্যে ইমাম কোনো ভুল করলে অর্থাৎ যখন দাঁড়ান দরকার তখন বসলে, কিংবা যখন বসা দরকার তখন দাঁড়ালে 'সুবহানাল্লাহ' বলে তার ভুল ধরে দেয়া মোকতাদীগণের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। 'সুবহানাল্লাহ' অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ তাআলা পাক ও মহান'। ইমামের ভুল ধরার সময় 'সুবহানাল্লাহ' বলার তাৎপর্য এই যে, কেবল আল্লাহ তাআলাই সকল প্রকার ভুল-ত্রুটি হতে পবিত্র ; তুমি মানুষ, তোমার ভুল হওয়া কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। ইমামের ভুল ধরার জন্য ইসলামে এটাই নিময় করা হয়েছে।

এ নিয়মে যখনই ইমামের ভুল ধরা হবে, তখন কোনো প্রকার লজ্জা-শরমের প্রশ্রয় না দিয়ে তার নিজ ভুল সংশোধন করে নেয়া উচিত। অবশ্য ভুল ধরে দেয়ার পরেও ইমাম যদি নিসন্দেহে মনে করে যে, তার কোনো ভুল হয়নি—সে ঠিক কাজ করেছে, তখন সে নিজ বিশ্বাস অনুসারে যথারীতি নামায সমাধা করবে। এমতাবস্থায় জামায়াতের লোকদের পক্ষে ইমামের ভুলকে ভুল মনে করেও তার অনুসরণ করা কর্তব্য। নামায শেষ হওয়ার পরে ইমামের সামনে তার ভুল প্রমাণ করে পুনরায় নামায পড়াবার দাবী করার অধিকার সকল নামাযীরই আছে।

ইমামের সাথে জামায়াতের লোকদের এরূপ ব্যবহার মাত্র ছোটখাট ভুলের ব্যাপারে হবে। কিন্তু ইমাম যদি নবীর সুন্নাতের খেলাফ নামায পড়াতে শুরু করে কিংবা নামাযের মধ্যে জেনে বুঝে কুরআন শরীফ ভুল পড়ে অথবা নামায পড়াবার সময় কোনো কুফরী, শিরকী বা প্রকাশ্য গুনাহের কাজ করে বসে—তখন নামায ছেড়ে দিয়ে সেই ইমাম পরিত্যাগ করা প্রত্যেক নামাযীর পক্ষেই ফরয।

মুসলমান সমাজকে জাতীয় জীবনে তাদের নেতাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, নামায সম্পর্কে শরীয়াতের এসব হেদায়াত দ্বারা তা চমৎকারভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

জামায়াতের সাথে নামায পড়ার যেসব সার্থকতা ও সুফলের কথা এখানে বলা হলো—তা দ্বারা আপনারা পরিষ্কারভাবে জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তাআলার এ একটি কথা মাত্র ইবাদাত—যা দিন ও রাতে পাঁচবার মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য করতে হয়—তাতে মুসলমানদের জন্য দুনিয়া আখেরাতে সকল স্থানেই বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তা দ্বারা বুঝতে পারা যায় যে, মাত্র এ একটি জিনিস মুসলমানকে যথার্থ ভাগ্যবান করে দিতে পারে এবং এটা কেমন করে মুসলমানকে আল্লাহর গোলামী এবং দুনিয়ায় নেতৃত্ব করার জন্য তৈরি করে দেয়। এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নামায যখন সকল কল্যাণে পরিপূর্ণ তখন বর্তমান সময় এর এতসব কল্যাণ কোথায় গেল ? এ প্রশ্নের জবাব পরবর্তী প্রবন্ধে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

নামাযের ফল পাওয়া যায় না কেন ?

পূর্বের প্রবন্ধগুলোতে নামাযের যে উপকারিতা ও সুফল দানের কথা আমি **নানাভাবে ব্যক্ত করেছি, সেই** নামায থেকে **বর্তমানে** লোকেরা সেই রকম **সুফল লাভে সক্ষম হচ্ছে** না কেন, এখানে এ প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করবো। **বর্তমান যুগে** নামায পড়ার পরেও মুসলমান এত লাঞ্ছিত ও দুর্বল কেন, তাদের **চরিত্র** উন্নত হচ্ছে না কেন, একটি অপরাজেয় শক্তিধর আল্লাহর সেনাবাহিনীতে পরিণত হচ্ছে না কেন, দুনিয়ার মধ্যে কাফেরদের বিপক্ষে তারা এত শক্তিহীন ও অবহেলিত কেন ? এটা সত্যিই একটি কঠিন প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব এ হতে পারে যে, মুসলমানগণ আসলে নামাযই পড়ে না, আর পড়লেও ঠিক সেভাবে এবং সেই নিয়মে পড়ে না, যেভাবে আর যে নিয়মে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল পড়তে আদেশ করেছেন। কাজেই যে নামায ঈমানদার ব্যক্তিকে উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছাতে পারে, আজিকার মুসলমানগণ বর্তমানের এ নামায হতে সেরূপ সুফল লাভের আশা করতে পারে না। কিন্তু আমি জানি, এতটুকু সংক্ষিপ্ত জবাবে আপনারা পরিতৃপ্ত হবেন না। কাজেই একটু বিস্তারিতভাবেই এর জবাব দেয়া আবশ্যক।

এই যে (মসজিদে) একটি দেয়াল ঘড়ি ঝুলছে, আপনি জানেন যে, এতে অনেক যন্ত্রাংশ একটি অন্যটির সাথে জড়িত রয়েছে। এতে যখন চাবি দেয়া হয়, তখন প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ নিজ নিজ কাজ শুরু করে এবং সেই সাথে বাইরের কাঁটায় ভিতরের যন্ত্রাংশগুলোর কাজের ফল প্রকাশ হতে থাকে। অর্থাৎ দু'টি কাঁটা ঘুরে ঘুরে সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড মিনিটের পর মিনিট বানিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বানাতে থাকে। এখন চিন্তা করে দেখুন, ঘড়ি বানাবার উদ্দেশ্য কি ? ঠিকভাবে সময় জানানই যে তার একমাত্র উদ্দেশ্য, একথা সকলেই জানেন। এজন্যই সঠিক সময় নির্দেশ করতে পারে এমন সব ছোট ছোট যন্ত্রাংশ এর মধ্যে একত্র করা হয়েছে। তারপর সেগুলোকে পরস্পর জুড়ে দেয়া হয়েছে। যেন সবগুলো মিলে যথারীতি চলতে থাকে এবং প্রত্যেকটি অংশ যেন সঠিক সময় জানাবার জন্য যতটুকু কাজ করা দরকার ঠিক ততটুকু কাজ করে—বেশী নয়, কমও নয়। পুনরায় তাতে চাবি দিবার নিয়ম করা হয়েছে। কেননা, চাবি না দিলে যন্ত্রাংশগুলো থেমে যাবে, তা সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না। তাই নির্দিষ্ট সময়ের পরে চাবি দিয়ে তাকে গতিশীল করে দেয়া হয়। ফলে সবগুলো যন্ত্রাংশ চলতে শুরু করে। এগুলোকে যখন ঠিকভাবে জুড়ে দেয়া হয় এবং তাতে চাবি দেয়া হয়, ঠিক তখনই যে উদ্দেশ্যে তা তৈরী

হয়েছে তা এ ঘড়ি দ্বারা লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু যদি ঠিকমত চাবি দেয়া না হয়, তবে তা ঠিকভাবে সময় নির্দেশ করতে পারবে না। যদি চাবি দেয়াও হয়, কিন্তু নিয়মানুসারে না দেয়া হয়, তাহলে ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাবে কিংবা চললেও ঠিকমত সময় নির্দেশ করতে পারবে না। যদি এর কোনো কোনো অংশ বের করে দিয়ে চাবি দেয়া হয়, তবে সে চাবি দেয়ায় কোনো ফলই হবে না। আর যদি এর কোনো অংশ বের করে সেখানে সিঙ্গার সেলাই মেশিনের অংশ লাগিয়ে দেয়া হয় এবং চাবি দেয়া হয়, তথাপি তা সময় নির্দেশ করতে পারবে না ; ওদিকে কাপড় সেলাই করার কাজও তার দ্বারা সম্ভব হবে না। এর সবগুলো যন্ত্রাংশ যদি একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করে এর মধ্যে রাখা হয়, তবে চাবি দিলেও তা চলবে না। প্রকাশ্যভাবে দেখতে গেলে তো বলতে হবে যে, ঘড়ির সব যন্ত্রাংশই এর মধ্যে আছে, কিন্তু যন্ত্রাংশ কেবল এর মধ্যে থাকলেই তো আর এর উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে না। কারণ, এদের পরস্পরের সাথে কোনো যোগ নেই এবং শ্রেণীবিন্যাস করে সেগুলোকে ঠিকমত সাজানও হয়নি। তাই সেগুলো পরস্পর চলতে পারছে না। এখানে যেসব অবস্থার কথা বলা হলো তাতে যদিও ঘড়িটি কোনো কাজ করবে না এবং তাতে চাবি দেয়া নিষ্ফল হবে তবুও বাইরের লোক তা দেখে কিছুই বুঝতে পারবে না যে, এটা ঘড়ি নয় বা এতে রীতিমত চাবি দেয়া হচ্ছে না। তারা তো বলবে যে, এটা দেখতে ঠিক ঘড়ির মতোই এবং সে জন্য ঘড়ি দ্বারা যে উদ্দেশ্য লাভ হয়, তাই পাওয়ার আশা করবে এজন্যই দূর থেকে তারা যখন দেখবে যে, আপনি ঘড়িতে ঠিক মত চাবি দিচ্ছেন, কাজেই ঘড়ি দ্বারা যে সুফল লাভ করা যায়, তা হতেও সে ঠিক তাই পাওয়ার আশা করবে। কিন্তু এর ভিতরে যখন ঘড়ির ঠিক অবস্থা বর্তমান নেই তখন বাহির থেকে ঘড়ির মত দেখালে কি হবে ? এর দ্বারা আসল ঘড়ির কাজ পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

ঘড়ির যে উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করলাম, তা দ্বারা আপনারা সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন। ইসলামকে এ ঘড়ির মত মনে করুন, ঘড়ির উদ্দেশ্য যেমন সঠিক সময় নির্দেশ করা, তেমনি ইসলামেরও উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ এ দুনিয়াতে আল্লাহর খলীফা—আল্লাহর সৈনিকরূপে বসবাস করবে। নিজেরা আল্লাহর হুকুম অনুসারে চলবে, অন্যকেও আল্লাহর বিধানের অধীন পরিচালিত করবে। কুরআন শরীফে একথাটি পরিষ্কার বলা হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط - ال عمران ١١٠

"তোমরা সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে সমগ্র মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের কাজ এই যে, তোমরা সকল মানুষকে ন্যায় কাজের আদেশ করবে, সকল অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে ফিরাবে এবং আল্লাহর প্রতি মযবুতভাবে ঈমান রাখবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ ـ

"আর এরূপে আমরা তোমাদেরকে (সর্বশ্রেষ্ঠ) জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমারা সকল মানুষ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পার।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ النور ٥٥

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে তাদের কাছে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাদের যমীনের বুকে তার খলীফা বানাবেন।"–সূরা আন নূর ঃ ৫৫

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ـ

"এই কাফেরদের সাথে লড়াই করো, যেন শেষ পর্যন্ত ফেত্‌না খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়।"

–সূরা আনফাল ঃ ৩৯

এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ঘড়ির যন্ত্রাংশের ন্যায় ইসলামেও অনেক কলকব্জা জমা করা হয়েছে। ইসলামের আসল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সেগুলো যেমন দরকারী, তেমনি পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণও। ইসলামের মৌলিক মতবাদ, আকায়েদ, নৈতিক চরিত্রের নিয়ম-নীতি, কাজ-কারবার, আদান-প্রদানের কায়দা-কানুন, আল্লাহর হক, মানুষের হক, নিজের হক আর দুনিয়ার অন্য যেসব জিনিসের সাথে মানুষের সম্পর্ক রয়েছে সেগুলোর হক, কামাই-রোযগার এবং খরচ করার রীতিনীতি, যুদ্ধ-জিহাদের নিয়ম-পন্থা, সন্ধি-সমঝোতার নিয়ম প্রণালী, রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান-পদ্ধতি এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে বসবাস করার নিয়ম—এসবগুলোই ইসলামের অঙ্গ—ইসলামের ছোট ছোট যন্ত্রাংশ এবং এগুলোকে ঘড়ির যন্ত্রাংশের ন্যায় একটির সাথে অন্যটিকে এমনভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, চাবি দিলেই তার সবগুলো ঠিকভাবে চলতে শুরু করে—আর এগুলো মিলিতভাবে চলার ফলে এর আসল উদ্দেশ্য ইসলামের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব এবং দুনিয়ায় আল্লাহর বিধানের প্রতিষ্ঠা

—এমন সুন্দর ও ধারাবাহিকভাবে লাভ হতে থাকে, যেমন ঘড়ির যন্ত্রগুলো চলার ফলে বাইরের সময় নির্দেশকারী কাঁটা সঠিক সময় জ্ঞাপন করে। ঘড়ির বিভিন্ন অংশগুলোকে পরস্পর জুড়ে দেবার জন্য কয়েকটি লোহার পাত ও ছোট ছোট লোহার কাঁটা ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ইসলামের বিভিন্ন কাজকে পরস্পরের সাথে যুক্ত রাখার জন্য এবং সেগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেণী বিন্যাস করার জন্য জামায়াত গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুসলমানদের এ জামায়াতের এমন একজন নেতা হবে যার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও বোধশক্তি এবং তাকওয়া-পরহেযগারীর বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকবে ; জামায়াতের কর্মীগণ তার কথা মেনে চলবে, তার কথা অনুসারে কাজ করবে। নেতা তাদের মিলিত শক্তির সাহায্যে লোকদের ওপর ইসলামী আইন জারী করবে এবং তাদের ইসলামী আইনের বিরোধিতা হতে বিরত রাখবে। এভাবে ইসলামের সবগুলো অংশ যখন পরস্পর যুক্ত হবে সেগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেণীবিন্যাস কায়েম করা হবে, তখন তাতে গতি আনার জন্য সেগুলোকে ঠিকমত চালাবার জন্য তাতে চাবি দেয়া আবশ্যক হয়। বস্তুত ইসলামী জীবনব্যবস্থায় নামায সেই চাবির কাজ করে। দিন-রাত পাঁচবার করে এ চাবি দেয়ার কাজ করতে হয়। তারপর এ ঘড়িকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাও দরকার। সে জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে। বছরে একবার করে ত্রিশ দিনের জন্য এটা সেই কাজ সমাধা করে। এ ঘড়িতে তেল দেয়া আবশ্যক, বছরে একবার যাকাত আদায় করে এ তেল দেয়ার কাজ করা হয়। এ তেল বাইর থেকে আমদানী করা হয় না, এ ঘড়িরই কোনো অংশ এটা তৈরি করে এবং অন্যান্য শুকনা অংশগুলোকে চলাবার যোগ্য করে দেয়। ঘড়িকে মাঝে মাঝে 'ওভারহল' করারও দরকার হয়, জীবনে একবার হজ্জ করলে এ 'ওভারহলিং'-এর কাজ সম্পন্ন হয়।

এখন সকলেই বুঝতে পারেন, এ চাবি দেয়া, পরিষ্কার করা, তেল দেয়া এবং ওভারহলিং করা ঠিক তখনি সার্থক হতে পারে, যখন এ ঘড়ির মধ্যে কেবল ঘড়িরই অংশগুলো পরস্পর যুক্ত ও সুবিন্যস্ত থাকবে, যেভাবে ঘড়ির নির্মাতা তা সাজিয়ে দিয়েছে। ঠিক এমন অবস্থায় চাবি দিলেই তা সঠিকভাবে চলতে পারে এবং ঠিকমত সময় নির্দেশ করতে পারে। একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যে, বর্তমান সময় ইসলামের অবস্থা এদিক দিয়ে বড়ই খারাপ। প্রথমত যে জামায়াত গঠনের সাহায্যে ইসলামের সমস্ত অংশ পরস্পর জুড়ে দেয়া হয়েছিল, সেই জামায়াতের অস্তিত্ব এখন নেই। ফলে সব অংশ-গুলোই আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। ঐক্য শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে। এখন যার যা ইচ্ছা সে তাই করে যাচ্ছে। কেউ বাধা দেবার নেই, সঠিক পথ দেখাবার কেউ

নেই। ইচ্ছা হলে ইসলামের আইন মেনে চলে, না হয় ইসলাম ত্যাগ করে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে। আজকের মুসলমান এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং তারা এ ঘড়ির অনেকগুলো অংশ বের করে নিজ নিজ ইচ্ছামত অনেক অংশ এতে যোগ করেছে, যা কোনোক্রমেই এ ঘড়ির অংশ হতে পারে না। কেউ 'সিঙ্গার মেশিনের' অংশ ঢুকিয়ে দিয়েছে, কেউ 'আটা কলের' এক অংশ তাতে লাগিয়ে দিয়েছে, আবার কেউ কেউ মোটর গাড়ীর কতক অংশ নিজের পসন্দ অনুসারে সন্ধান করে এনে এতে জুড়ে দিয়েছে। এখন এরা একদিকে মুসলমান, অন্যদিকে সুদী কারবার চালাচ্ছে, ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে জীবন বীমা করছে, ইংরেজী আইনের ভিত্তিতে গড়া আদালতে মিথ্যা মোকদ্দমা চালাচ্ছে। কাফেরদের অনুগত হয়ে তাদের খেদমত করছে। নিজেদের মেয়ে, বোন আর স্ত্রীদেরকে 'মেম' বানাচ্ছে। নিজেদের সন্তানদেরকে জড়বাদী শিক্ষা দান করছে। এদিকে মার্কস ও লেলিনের অনুকরণ করাচ্ছে এবং অন্য দিকে বৃটেন ও আমেরিকার নীতিও স্বীকার করাচ্ছে। মোটকথা, ইসলাম বিরোধী অসংখ্য জিনিস এনে স্বয়ং মুসলমানগণই ইসলামের এ ঘড়ির সাথে জুড়ে দিয়েছে।

এসব অবাঞ্ছনীয় কাজ করার পরও যদি কেউ আশা করে যে, চাবি দিলেই ঘড়ি ঠিকমত চলবে, আর যে উদ্দেশ্যে ঘড়ি বানানো হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যও এটা দ্বারা হাসিল হবে, আর পরিচ্ছন্ন করে তেল দেয়া এবং ওভারহলিং করায় যে ফল পাওয়া উচিত, তাও যদি কেউ এটা দ্বারা পেতে চায়, তবে তাকে চরম নির্বোধ ছাড়া কি-ই বা বলা যেতে পারে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই অনায়াসে বুঝা যায় যে, বর্তমানে এ ঘড়ির (ইসলামের) যে দশা হয়েছে, তাতে জীবন ভর চাবি দিলে, সাফ করলে এবং তেল দিতে থাকলেও এর আসল উদ্দেশ্য কিছুতেই হাসিল হতে পারে না। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য মেশিনের অংশগুলো এর মধ্যে থেকে বের করা না হবে এবং সেই স্থানে এর আসল অংশগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিকভাবে সাজিয়ে দেয়া না হবে—প্রথম ঘড়ি প্রস্তুত করার সময় যেমন সাজান হয়েছিল—ততক্ষণ পর্যন্ত এর দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভ করার কোনো আশাই করা যায় না।

বিষয়টি খুব ভাল করে বুঝে নেয়া আবশ্যক। মুসলমানদের নামায, রোযা এবং হজ্জ ও যাকাত সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হওয়ার কারণ এটাই। প্রথমত তাদের মধ্যে খুব কম লোকই রীতিমত নামায আদায় করে, রোযা রাখে, যাকাত দেয় ও হজ্জ করে। জামায়াতী বন্ধন ও শৃংখলা চূর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ একেবারে স্বেচ্ছাচারী হয়ে গিয়েছে। ইসলামের এ ফরযগুলো কেউ আদায় করছে কিনা তা জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। অতপর যারা তা আদায় করে তারাইবা কিভাবে আদায় করে। আজ জামায়াতের সাথে নামায

পড়ার প্রচলন প্রায় নেই, কোথাও জামায়াতের ব্যবস্থা থাকলেও সেখানকার মসজিদে এমন লোককে ইমাম নিযুক্ত করা হয়, যার দ্বারা দুনিয়ার অন্য কোনো কাজ সমাধা হতে পারে না—সেই যোগ্যতাও তার নেই। যারা মসজিদের রুটি খায়, দ্বীনি ফরয পালন করাকে যারা একটি রোযগারের উপায় বলে মনে করে, যারা জ্ঞান ও ইলমের ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ, নৈতিক শক্তিহীন এবং চরিত্রের দিক দিয়ে বড় অনগ্রসর, অধিকাংশ সেই শ্রেণীর লোকদেরকেই ধরে মসজিদের ইমাম বানিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ সকল মুসলমানকে আল্লাহর খাঁটি খলীফা আর দুনিয়ায় আল্লাহর সৈনিকে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই এ ইমাম নিযুক্তির নিয়ম করা হয়েছিল। এভাবে নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জের যে অবস্থা আজকাল হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়।

এতসব সত্ত্বেও অনেকে বলতে পারে যে, আজকাল অনেক মুসলমান ফরয আদায় করছে, আপন আপন কর্তব্য যথারীতি পালন করছে। কিন্তু ওপরে যেমন বলা হয়েছে, ঘড়ির কতক অংশ বের করে দিয়ে সেই স্থানে অন্য মেশিনের কতকগুলো অংশ জুড়ে দেয়ার পরে তাতে চাবি দেয়া না দেয়া, সাফ করা না করা এবং তেল দেয়া না দেয়া একই কথা—সবই একেবারে নিষ্ফল এবং অর্থহীন। দূর হতে দেখলে তো এটাকে 'ঘড়ি' বলেই মনে হবে। বাহির থেকে কেউ দেখে অবশ্যই বলবে যে, এটাই ইসলাম এবং আপনারা মুসলমান। আপনারা যখন এ ঘড়িতে চাবি দেন বা তা সাফ করেন, তখন দূর থেকে দেখে লোকগণ মনে করে যে, আপনারা ঠিক মতই 'চাবি' দিচ্ছেন আর 'সাফ' করছেন। কেউ বলতে পারে না যে, এটা নামায নয়, এটা রোযা নয় কিন্তু এর ভিতরে যে কি আছে, তা বাহির থেকে যারা দেখবে তারা কেমন করে বুঝবে ?

আজ মুসলমানদের দ্বীনি কাজ-কর্ম নিষ্ফল হচ্ছে কেন ? তার মূল কারণ আমি আপনাদের সামনে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করলাম। একথাও বুঝিয়ে দিলাম যে, মুসলমানগণ নামায পড়ে আর রোযা রেখেও আল্লাহর সৈনিক হতে পারছে না কেন ; বরং তারা কাফেরদের খাদেম ও অন্ধভাবে তাদের পদাংক অনুসরণকারী এবং নানাভাবে মযলুম হচ্ছে কেন ? যদি কিছু মনে না করেন তাহলে এটা অপেক্ষাও অনেক দুঃখের কথা আমি বলতে পারি। বর্তমান দুরবস্থার জন্য মুসলমানদের দিলে নিশ্চয়ই দুঃখ বা কষ্ট আছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও সত্য যে, বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে হাজারে নয়শত নিরানব্বইজন বরং তার চেয়েও বেশী লোক এমন রয়েছে যারা এ দুরবস্থা দূর করার জন্য চেষ্টা করতে মোটেই রাজি নয়। ইসলামের এ 'ঘড়ির' ভিতরের কলকব্জা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের মর্জী মত এক একটা নূতন অংশ এতে লাগিয়ে দিয়েছে, একে সংশোধন করতে অর্থাৎ অন্য

মেশিনের অংশগুলো বের করে এবং এর আসল অংশগুলোকে যথাযথ সাজিয়ে একে ঠিক করতে আজ মুসলমানগণ সম্পূর্ণ নারাজ। এমনকি, কেউ তা করতে চাইলেও এরা তাকে বরদাশত পর্যন্ত করতে পারে না। কারণ অন্য মেশিনের জিনিসগুলো যখন এর মধ্য থেকে বের করা হবে, তখন প্রত্যেকেরই প্রিয় জিনিস বের হয়ে যাবে। কিন্তু অপর লোকদের প্রিয় জিনিস বের হয়ে যাবে ; আর নিজে বাইরের যে অংশ এতে জুড়ে দিয়েছে তা তাতে থাকতে দেয়া হবে, এটা তো হতে পারে না। এভাবে তার আসল অংশগুলো যখন ঠিকমত সাজিয়ে মযবুত করে বাঁধা হবে তখন সেই সাথে নিজেরাও বন্দী হয়ে পড়বে বলে এদের ভয় হচ্ছে। কেননা, সকলকে শক্ত করে বাঁধলে একজনকেও নিশ্চয়ই মুক্ত ও অবাধ রাখা যেতে পারে না। আর এটা এমন কষ্টকর ব্যাপার, যা ইচ্ছা করে সহ্য করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য তারা চায় যে, এ ঘড়ি যেমন আছে তেমনি ঝুলতে থাকুক, আর দূর হতে লোকেরা দেখে এটাকে ঘড়ি মনে করে প্রতারিত হতে থাকুক। পক্ষান্তরে যারা এহেন অকর্মণ্য ঘড়িকে অত্যন্ত ভালোবাসে, তারা এতে খুব ঘন ঘন চাবি দিতে আর একে সাফ করতেই মশগুল। কিন্তু কোনো দিন ভুলক্রমে এর অংশগুলো ঠিকমত সাজাতে এবং অন্য মেশিনের জিনিসগুলো বের করে ফেলতে প্রস্তুত হবে না, এটা সত্যই দুঃখের কথা।

আমি যদি আপনাদের এরূপ মতে সায় দিতে পারতাম তাহলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু আমি তা পারছি না। যে সত্য আমি জানতে পেরেছি, তার বিরুদ্ধে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, বর্তমান অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সাথে তাহাজ্জুদ, এশরাক, চাশত প্রভৃতি নামাযও যদি পড়া হয়, পাঁচ ঘন্টা করে দৈনিক কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয়, রমযান শরীফ ছাড়াও বছরে অবশিষ্ট এগার মাসের সাড়ে পাঁচ মাসও যদি রোযা রাখা হয় তবুও কোনো ফল হবে না। তবে ঘড়ির মধ্যে তার আসল কলকব্জা রেখে ঠিকমত সাজানোর পরে সামান্য একটু চাবি দিলেই তা চলতে থাকবে, আর সঠিকভাবে সময়ও নির্দেশ করতে পারবে। তখন খানিকটা সাফ করা আর কয়েক ফোটা তেল দিলেও অনেক সুফল লাভ করা যাবে। অন্যথায় সারাজীবন ভরে চাবি দিলেও এ ঘড়ি কখনো চলবে না এবং এর দ্বারা আসল উদ্দেশ্য লাভ করাও যাবে না।

রোযা

নামাযের পরেই মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তাআলা যে ইবাদাত ফরয করেছেন তা হচ্ছে রযমান মাসের রোযা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বন্ধ রাখার নামই রোযা। নামাযের ন্যায় এ রোযাকেও আবহমানকাল থেকে সকল নবীর শরীয়াতেই ফরয করা হয়েছে। অতীতের সকল নবীর উম্মাতগণ এমনিভাবেই রোযা রাখতো, যেমন রাখছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতগণ। অবশ্য রোযার হুকুম আহকাম, রোযার সংখ্যা এবং রোযার সময় ও মুদ্দতের ব্যাপারে বিভিন্ন নবীগণের শরীয়াতে পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রত্যেক ধর্মেই রোযা রাখার প্রথা কোনো না কোনো প্রকারে বর্তমান আছে। অবশ্য তারা এতে নিজেদের ইচ্ছামত অনেক কিছু যোগ করে নিয়েছে এবং নানাভাবে এর রূপ বিকৃত করে দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কুরআন মজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ـ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৩

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর তরফ থেকে যত শরীয়াত দুনিয়ায় নাযিল হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই রোযা রাখার বিধি-ব্যবস্থা ছিল। চিন্তা করার বিষয় এই যে, রোযার মধ্যে এমন কি বস্তু নিহিত আছে, যার জন্য আল্লাহ তাআলা সকল যুগের শরীয়াতেই এর ব্যবস্থা করেছেন।

ইতিপূর্বে আরো কয়েকবার বলেছি যে, মানুষের সমগ্র জীবনকে ইবাদাত অর্থাৎ আল্লাহর বন্দেগীতে পরিণত করাই হচ্ছে ইসলামের আসল উদ্দেশ্য। মানুষ জন্মগতভাবেই আল্লাহর বান্দাহ, আল্লাহর বন্দেগী তাঁর প্রকৃত স্বভাব। কাজেই ইবাদাত অর্থাৎ চিন্তা ও কর্মের দিক দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর বন্দেগী পরিত্যাগ করা মানুষের পক্ষে উচিত নয়। জীবনের প্রত্যেকটি কাজ এবং সকল সময় চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহর সন্তোষ কিসে, আর কোন্ জিনিসে তার অসন্তোষ। তারপর যে দিকেই এবং যে কাজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা যাবে, মানুষের সে দিকেই যাওয়া উচিত এবং যেদিকে তাঁর অসন্তুষ্টি সেদিক থেকে ঠিক তেমিন দূরে থাকা উচিত, যেমন আগুন থেকে প্রত্যেকটি মানুষ দূরে থাকে। যে পথ আল্লাহ পসন্দ করেন সেই

পথে চলা, যে পথ তিনি পসন্দ করেন না সেই পথে না চলাই মানুষের কর্তব্য। এভাবে মানুষের সমগ্র জীবন যখন গঠিত হবে তখন প্রমাণিত হবে যে, সে যথাযথভাবে আল্লাহর বন্দেগী করছে এবং وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ـ(الذريت) "মানুষ ও জ্বীন জাতিকে কেবল আমার ইবাদাত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" আল্লাহর এ ঘোষণা অনুসারে সে নিজের জন্মের উদ্দেশ্য সার্থক করতে পেরেছে।

একথাও পূর্বে বলা হয়েছে যে, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত নামে পরিচিত যে ইবাদাতগুলো মানুষের প্রতি ফরয করা হয়েছে, মানুষকে সেই আসল ইবাদাতের জন্য তৈরি করাই হচ্ছে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এগুলো ফরয সাব্যস্ত করার অর্থ এ নয় যে, গুণে গুণে দিনে রাতে পাঁচবার নামায পড়লেই, রমযান মাসে ত্রিশ দিন ধরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষুৎ পিপাসার কষ্ট সহ্য করলেই, মালদার হলে বছরে একবার যাকাত এবং জীবনে একবার হজ্জ আদায় করলেই আল্লাহর প্রতি মানুষের কর্তব্য পুরোপুরি পালন হয়ে গেল এবং তারপর মানুষের পূর্ণ আযাদী—যা ইচ্ছে তাই করতে পারে—বরং এ ইবাদাতগুলোর ভিতর দিয়ে মানুষকে ঠিকভাবে গঠন করা এবং তার গোটা জীবনকে আল্লাহর বন্দেগীর যোগ্য করে তোলাই হচ্ছে এ ইবাদাতগুলোকে ফরয করার আসল উদ্দেশ্য। এখন উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিচার করতে হবে যে, রোযা মানুষকে কেমন করে সেই আসল ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত করে।

রোযা ছাড়া অন্যান্য যেসব ইবাদাত আছে, তা পালন করার জন্য কোনো না কোনো রূপে বাহ্যিক প্রকাশের আশ্রয় নিতে হয়। নামায পড়ার সময় নামাযীকে ওঠা-বসা ও রুকূ'-সিজদা করতে হয়। এটা অন্য লোকে দেখতে পারে। হজ্জ করার জন্য দীর্ঘ পথ সফর করতে হয়, আর সেই সফরও করতে হয় হাজার হাজার মানুষের সাথে মিলে। যাকাত আদায়ের ব্যাপারেও অন্ততপক্ষে দু'জনকে জানতে হয়—একজন দেয়, আর একজন তা গ্রহণ করে। এসব ইবাদাতের কথা কারো কাছে গোপন থাকতে পারে না। এটা আদায় করলেই অন্য লোকে জানতে পারে। কিন্তু 'রোযার' কথা আল্লাহ এবং রোযাদার ভিন্ন অন্য কেউ জানতে পারে না। এক ব্যক্তি যদি সকলের সামনে সেহরী খায় ইফতারের সময় সকলের সাথে মিলে ইফতার করে আর দিনের বেলা গোপনে কিছু খায় বা পান করে, তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। প্রকাশ্যভাবে সকল লোকই তাকে রোযাদার বলে মনে করবে একথা ঠিক ; কিন্তু আসলে সে মোটেই রোযাদার নয়।

রোযার এ দিকটা সামনে রেখে চিন্তা করুন। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে রোযা রাখে লুকিয়ে কিছু পানাহার করে না, কঠিন গরমের সময় পিপাসায় কলিজা যখন ফেঁটে যাবার উপক্রম হয় তখন যে এক ফোঁটা পানি পান করে না—অসহ্য ক্ষুধার দরুন চোখে তারা ফুটতে শুরু করলেও কোন কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করে না—সেই ব্যক্তির ঈমান কত মযবুত ? আল্লাহ তাআলা যে আলেমুল গায়েব সেই কথা সে কতখানি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে। কত নিসন্দেহে সে জানে যে, তার কাজ দুনিয়ার লোকদের কাছে অজানা থাকলেও সারাজাহানের মালিকের কাছে কিছু অজানা নয়। তার মনে আল্লাহর ভয় কত তীব্র, অসহ্য কষ্ট স্বীকার করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়েই সে এমন কাজ করে না যাতে তার রোযা ভেঙ্গে যেতে পারে। পরকালের বিচারের প্রতি তার আকীদা-বিশ্বাস কত দৃঢ়। এক মাস সময়ের মধ্যে সে কমপক্ষে তিনশত ষাট ঘন্টাকাল রোয থাকে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পরকাল সম্পর্কে তার মনে কখনো কোনো সন্দেহ জাগে না। এ ব্যাপারে তার মনে যদি এতটুকু সন্দেহ হতো যে, পরকাল আছে কিনা, কিংবা সেখানে আযাব বা সওয়াব হবে কিনা বলে কোনো দ্বন্দ্ব যদি তার মনে থাকতো তাহলে সে কিছুতেই তার রোযা পূর্ণ করতে পারতো না। এ সন্দেহ সৃষ্টি হলে কেবল আল্লাহর হুকুম বলে মানুষ কিন্তু পানাহার না করার সংকল্পে মযবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

এভাবে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বছর এক মাসকাল মুসলমানদের ঈমানের ধারাবাহিক পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এ পরীক্ষায় মানুষ যতই মযবুত হয়, ততই তার ঈমান দৃঢ় হয়। বস্তুত এটা পরীক্ষার ওপরে পরীক্ষা, ট্রেনিং-এর ওপর ট্রেনিং। কারো কাছে যখন কোনো আমানত রাখা হয় তখন তার ঈমান বড় পরীক্ষায় পড়ে যায়। যদি সে এ পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে এবং সে যদি আমানতের খেয়ানত না করে, তখন তার মধ্যে আমানতের বোঝা বহন করার আরও বেশী ক্ষমতা হয়। ক্রমে সে আরও আমানতদার হতে থাকে। তদ্রূপ আল্লাহ তাআলাও ক্রমাগতভাবে এক মাসকাল পর্যন্ত দৈনিক বারো চৌদ্দ ঘন্টা ধরে মুসলমানদের ঈমানকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। এ পরীক্ষায় সে যখন পুরোপুরিভাবে উত্তীর্ণ হয় তখন তার মধ্যে আল্লাহকে ভয় করে অন্যান্য গুনাহ হতে ফিরে থাকার যোগ্যতা অধিক পরিমাণে জাগ্রত হয়। তখন সে আল্লাহকে 'আলেমুল গায়েব' মনে করে গোপনেও আল্লাহর আইন ভঙ্গ করতে পারে না। প্রত্যেকটি কাজে সে সেই কিয়ামতের দিনকে মনে করবে যেদিন সবকিছুই খুলে যাবে এবং নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকটি ভাল কাজে ভাল ফল এবং মন্দ কাজের মন্দ ফল দেয়া হবে। একথা বলা হয়েছে কুরআন পাকে নিম্নলিখিত আয়াতে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ - البقرة : ١٨٣

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন **তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর ফরয করা হয়েছিল।** সম্ভবত তোমরা **পরহেযগার হবে।"–সূরা আল** বাকারা ঃ ১৮৩

রোযার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা মুসলমানকে দীর্ঘকাল শরীয়াতের হুকুম ধারাবাহিকভাবে পালন করতে বাধ্য করে। নামাযের এক ওয়াক্তে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে। যাকাত বছরে একবার মাত্র আদায় করতে হয়। হজ্জে অবশ্য দীর্ঘ সময় লাগে, কিন্তু তার সুযোগ সমগ্র জীবনে মাত্র একবারই এসে থাকে। তাও আবার সকল মুসলমানের জন্য নয়, কেবল মালদার লোকেরাই সেই সুযোগ পায়। কিন্তু রোযা এসব ইবাদাত হতে সম্পূর্ণ আলাদা। তা প্রত্যেক বছর পূর্ণ একটি মাস ধরে দিন-রাত প্রত্যেক (সমর্থ) মুসলমানকে ইসলামী শরীয়াত পালনের অভ্যাস করায়। শেষ রাতে সেহরী খাওয়ার জন্য ওঠতে হয়, একটি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই খানাপিনা সব বন্ধ করতে হয়, সারাদিন কোনো কোনো কাজ কিছুতেই করা যায় না, সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে ইফতার করতে হয়—একটু আগেও নয়, একটু পরেও নয়। ইফতারের পরে খানাপিনা ও আরাম করার অনুমতি আছে। কিন্তু তার পরেই তারাবীহ্ নামাযের জন্য দৌড়াতে হয়। এভাবে প্রত্যেক বছর পূর্ণ একটি মাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুসলমানকে ক্রমাগতভাবে সিপাহীদের ন্যায় একটি মযবুত আইনের দ্বারা বেঁধে রাখা হয়। তারপর এগারো মাসের জন্য তাকে জীবনের কর্মক্ষেত্রে মুক্ত করে দেয়া হয়। এ মাসে যে ট্রেনিং সে পেয়েছে, পরবর্তী এগারো মাস তার কাজ-কর্মের ভিতর তা যেন প্রতিফলিত হয় এবং তারপরও কোনো বিষয় অসম্পূর্ণ থাকলে পরবর্তী বছর তা যেন পূর্ণ করে দেয়া হয়।

মুসলমান সমাজের এক এক ব্যক্তিকে আলাদাভাবে এ ট্রেনিং নেয়ার ব্যবস্থা করা হলে তা মোটেই ফলপ্রসু হতো না। সৈনিকদেরকে কখনো এক একজন করে প্যারেড করানো হয় না, গোটা সৈন্যবাহিনীকে একত্রে এক সাথে তা করান হয়। সকলকে একই সময় 'বিউগলের' আওয়ায শুনে উঠতে হয় এবং 'বিউগলের' আওয়ায অনুসারে নির্দিষ্ট কাজে লেগে যেতে হয়। ফলে সৈন্যদের মধ্যে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার অভ্যাস হয়। সেই সাথে একজনের ট্রেনিং-এ অন্যজন সহযোগিতা করে থাকে। একজনের ট্রেনিং কোনোরূপ অসম্পূর্ণ থাকলে দ্বিতীয়জন এবং দ্বিতীয়জনের অসম্পূর্ণ থাকলে তৃতীয়জন তা পূর্ণ করে থাকে।

ঠিক এজন্য ইসলামে রমযান মাসকে রোযা পালন করার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সমগ্র মুসলমানকে আদেশ করা হয়েছে, তারা সকলে মিলে এ সময়ে রোযা রাখতে শুরু করবেন। বস্তুত এ হুকুমটি মানুষের ব্যক্তিগত ইবাদাতকে সামগ্রিক ইবাদাতে পরিণত করে দিয়েছে। এক সংখ্যাকে লক্ষ দ্বারা গুণ করলে যেমন লক্ষের একটি বিরাট সংখ্যা হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি এক এক ব্যক্তির আলাদাভাবে রোযা রাখায় যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায় লক্ষ কোটি মানুষ একত্রে রোযা রাখলে লক্ষ কোটি গুণ বেশী উন্নতি লাভ করা সম্ভব। রমযানের মাস সমগ্র পরিবেশকে নেকী আর পরহেযগারীর পবিত্র ভাবধারায় উজ্জল করে তুলে। গোটা জাতীয় জীবনে তাকওয়া পরহেযগারীর সবুজ তাজা ফসল বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজেকেই গুনাহ হতে বাঁচাতে চেষ্টা করে না বরং তার মধ্যে কোনো প্রকার দুর্বলতা থাকলে তার জন্য অন্য সব রোযাদার ভাই তার সাহায্য ও সহযোগিতা করে। রোযা রেখে গুনাহ করতে প্রত্যেকটি মানুষের লজ্জাবোধ হয় ; পক্ষান্তরে প্রত্যেকের মনে কিছু ভাল ও সওয়াবের কাজ করার ইচ্ছা জাগে। সম্ভব হলে গরীবকে একবেলা খাবার দেয়, উলঙ্গ ব্যক্তিকে কাপড় দান করে, বিপন্নের সাহায্য করে। কোথাও নেক কাজ হতে দেখলে তাতে অংশগ্রহণ করে। আর কোথাও প্রকাশ্যভাবে পাপ অনুষ্ঠান হতে থাকলে তা বন্ধ করতে চেষ্টা করে। এভাবে চারদিকে নেকী ও তাকওয়ার একটি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সকল প্রকারের পুণ্য ও ভাল কাজ বৃদ্ধি পাওয়ার অনুকূল মৌসুম শুরু হয়। বস্তুত দুনিয়াতে সকল ফসল নির্দিষ্ট মৌসুমে ফলে থাকে। তখন চারদিকে কেবল সেই ফসলেরই চমৎকার দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্যই শেষ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشَرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ـ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلاَّ الصَّوْمُ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ ـ

"মানুষের প্রত্যেকটি কাজের ফল আল্লাহর দরবারে কিছু না কিছু বৃদ্ধি পায় ; একটি নেক কাজের ফলে দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বেশী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ বলেন রোযাকে এর মধ্যে গণ্য করা হবে না। কারণ রোযা খাছ করে কেবল আমারই জন্য রাখা হয়। আর আমিই এর প্রতিফল দান করবো।"

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানা গেল যে, নেক কাজ যে করে তার নিয়ত অনুসারে নেক কাজের ফল অত্যধিক বৃদ্ধি পায় বটে ; কিন্তু সেই সবের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। কিন্তু রোযার ফল বৃদ্ধির কোনো শেষ সীমা নির্দিষ্ট

নেই। রমযান মাস যেহেতু মঙ্গল, কল্যাণ ও নেকী বৃদ্ধি পাবার মৌসুম, এ মৌসুমে কেবল একজন মুসলমানই নয়, লক্ষ কোটি মুসলমান মিলে এ নেকীর বাগিচায় পানি ঢালে। এজন্য তা সীমা সংখ্যাহীন ফল দান করতে পারে। এ মাসে যত ভাল নিয়তের সাথে ভাল কাজ করা যাবে, যত বরকত রোযাদার নিজে লাভ করবে এবং অন্য রোযাদার ভাইকে দিতে চেষ্টা করবে—তারপর পরবর্তী এগারো মাস পর্যন্ত এ মাসের যত প্রভাব রোযাদারের ওপর থাকবে এটা ততবেশী সুফল দেবে। এটা এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে যার কোনো শেষ সীমা পরিসীমা থাকবে না। এখন মুসলমান নিজেরাই যদি এটাকে সীমাবদ্ধ করে রাখে, তবে সে কথা স্বতন্ত্র।

রোযার এ আশ্চর্যজনক সুফল এবং বরকতের কথা শুনে প্রত্যেকের মনেই এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আজ তা কোথায় গেল ? মুসলমান আজ রোযা রাখে নামায পড়ে। কিন্তু এর সুফল যা বর্ণনা করা হয় তা তারা আদৌ লাভ করছে না কেন ? এর একটি কারণ আমি পূর্বেই বলেছি। তা এই যে, ইসলামের ব্যাপক বিধানের বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে ফেলার পর এবং তাতে বাইরের অনেক নূতন জিনিসের আমদানীর পর তা থেকে আসল ফল লাভের আশা করা যায় না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ইবাদাত সম্পর্কে বর্তমান মুসলমানদের দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তারা এখন মনে করছে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু খানাপিনা না করার নামই ইবাদাত। আর এ কাজ কোনো লোক করলেই তার ইবাদাত পূর্ণ হলো, এরূপ মনে করা হয়। এভাবে অন্যান্য ইবাদাতেরও কেবল বাইরের কাঠামো ও অনুষ্ঠানকেই ইবাদাত বলে মনে করা হয়। এজন্যই ইবাদাতের আসল ভাবধারা যা মুসলমানদের প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হওয়া আবশ্যক। মুসলমানদের শতকরা ৯৯জন বরং তার চেয়েও বেশী লোক তা থেকে বঞ্চিত। ঠিক এজন্যই ইবাদাতসমূহ পূর্ণ ফল দেখাতে পারে না। কারণ ইসলামে নিয়ত, বুদ্ধি-বিবেচনা এবং আন্তরিকতার ওপরই সবকিছু নির্ভর করে। পরবর্তী প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

রোযার মূল উদ্দেশ্য

মানুষ যে কাজই করে না কেন, তাতে দু'টি জিনিস অবশ্যই থাকবে ঃ একটি তার উদ্দেশ্য—যে জন্য সেই কাজ করা হয়। অন্যটি সেই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য গৃহীত পন্থা। উদারহণ স্বরূপ ভাত খাওয়ার কথা বলা যেতে পারে। ভাত খাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বেঁচে থাকা এবং দৈহিক শক্তির স্থায়িত্ব। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য 'গ্রাস' বানাতে হয়, মুখে দিতে হয়, চিবাতে হয় এবং গিলতে হয়। খাওয়ার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ও সর্বাপেক্ষা বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ পন্থা এটাই। এজন্য খাওয়ার কাজ সমাধার জন্যই এটাকে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সকলেই জানেন যে, এ ব্যাপারে আসল জিনিস হচ্ছে এর উদ্দেশ্য—যে জন্য খাওয়া হয়—খাওয়ার এ পন্থাটি আসল বস্তু নয়। এখন কোনো ব্যক্তি যদি মাটি, ছাঁই বা বালি মুঠি ভরে মুখে দেয় এবং চিবিয়ে গিলে ফেলে ; তবে তাকে কি বলা যাবে ? বলতেই হবে যে, তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু কেন ? এজন্য যে, খাওয়ার এ চারটি নিয়ম পালন করলেই তো আর খাওয়ার উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। তেমনি যে ব্যক্তি ভাত খাওয়ার সাথে সাথে বমি করে ফেলে, তারপরও সে যদি অভিযোগ করে যে, ভাত খাওয়ার যে উপকারিতা বর্ণনা করা হয়, তা আমি মোটেই পাচ্ছি না। বরং আমি তো ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছি, মৃত্যু আমার নিকটবর্তী। এ নির্বোধ ব্যক্তি নিজের এ দুর্বলতার জন্য খাওয়ার ওপরে দোষারোপ করছে, অথচ আসলে এটা তারই নির্বুদ্ধিতার ফল মাত্র। সে নির্বোধের ন্যায় মনে করেছে ঃ যে কয়টি নিয়ম পালনের দ্বারা খাওয়ার কাজ সমাধা করা হয়, ব্যাস, শুধু সেই কয়টি সম্পন্ন হলেই জীবনী শক্তি লাভ করা যাবে। এজন্যই সে মনে করেছে যে, এখন পেটে ভাতের বোঝা রেখে লাভ কি, তা বের করে ফেলাই উচিত। এভাবে পেট হালকা হয়ে যাবে। খাওয়ার বাহ্যিক নিয়ম তো পালন করা হয়েছে। এ নির্বোধ ব্যক্তি এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছে এবং কার্যত তাই করছে। সুতরাং তার দুর্ভোগ তাকেই ভুগতে হবে। একথা তার জানা উচিত ছিল যে, ভাত যতক্ষণ পর্যন্ত পেটে গিয়ে হযম না হবে এবং রক্তে পরিণত হয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে না পড়বে—ততক্ষণ পর্যন্ত জীবনী শক্তি কিছুতেই লাভ করা সম্ভব নয়। খাওয়ার কাজের বাহ্যিক নিয়মগুলো যদিও অপরিহার্য, কারণ তা ছাড়া ভাত পেটের মধ্যে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু এ বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন করলেই খাওয়ার আসল উদ্দেশ্য লাভ করা যায় না। এ বাহ্যিক অনুষ্ঠানে এমন কোনো যাদু নেই যে, এগুলো সম্পন্ন হলেই ঐন্দ্রজালিক উপায়ে তার শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহিত হবে। রক্ত সৃষ্টির জন্য

আল্লাহ তাআলা যে নিয়ম বানিয়ে দিয়েছেন, তা সেই নিয়ম অনুসারেই হতে পারে। সেই নিয়ম লংঘন করলে ধ্বংস অনিবার্য।

এখানে যে উদাহরণটি বিস্তারিতভাবে বললাম, তা একটু চিন্তা করলেই বর্তমান মুসলমানদের ইবাদাত নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার কারণ সহজেই বুঝতে পারা যায়। পূর্বে যেমন একাধিকবার বলেছি বর্তমানে মুসলমানগণ নামায রোযার আরকান (আভ্যন্তরীণ জরুরী কাজ) এবং তার বাহ্যিক অনুষ্ঠানকেই আসল ইবাদাত বলে মনে করেছে। অথচ এটা অপেক্ষা বড় ভুল আর কিছুই হতে পারে না। তারা মনে করে যে, এ অনুষ্ঠানসমূহ যে ব্যক্তি ঠিকভাবে আদায় করলো, সে আল্লাহর ইবাদাত সুসম্পন্ন করলো। এদেরকে সেই ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যে ব্যক্তি ভাতের মুঠি বানাল, মুখে রাখল, চিবালো এবং গিলে ফেললো। আর এ চারটি কাজ করাকেই খাওয়া এবং খাওয়ার উদ্দেশ্য এটা থেকেই হাসিল হলো বলে মনে করেছে। সে এভাবে মাটি খেলো কিংবা বালি খেলো অথবা তা বমি করে ফেললো তাতে কিছু যায় আসে না। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, মুসলমানদের এ ভ্রান্তি যদি না হয়ে থাকে তাহলে রোযাদার ব্যক্তি কেমন করে মিথ্যা কথা বলতে পারে ও কেমন করে পরের 'গীবত' করতে পারে, কথায় কথায় তারা লড়াই-ঝগড়া কেমন করে করতে পারে ? তাদের মুখ থেকে গালি-গালায ও অশ্লীল কথা কেমন করে বের হয় ? পরের হক তারা কিভাবে কেড়ে নেয় ? হারাম খাওয়া ও অন্যকে হারাম খাওয়ানোর কাজ কেমন করে করতে পারে যে, তারা আল্লাহর ইবাদাত করছে। বালি কিংবা মাটি খেয়ে যারা মনে করে যে, তারা খাওয়ার কাজ সমাধা করছে, এরা ঠিক তাদেরই মতো।

বিশেষভাবে ভেবে দেখার বিষয় এই যে, গোটা রমযান মাস ভরে ৩৬০ ঘন্টাকাল আল্লাহর ইবাদাত করার পরে যখন মুসলমানগণ অবসর গ্রহণ করে তখন শাওয়ালের প্রথম তারিখেই এ বিরাট ইবাদাতের সকল প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় কেন ? হিন্দু জাতি তাদের মেলা-উৎসবে যাকিছু করে, মুসলমানগণ ঈদের উৎসবে ঠিক তাই করে। এমনকি শহর অঞ্চলে ঈদের দিন ব্যভিচার, নাচ-গান, মদ পান আর জুয়া খেলার তুফান বইতে শুরু করে। অনেক লোককে এমনও দেখা যায় যে, দিনের বেলা রোযা রেখে সারারাত মদ খায়, যেনা করে। সাধারণ মুসলমান আল্লাহর ফযলে এতটা পথভ্রষ্ট এখনো হয়নি ; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, রমযান খতম হওয়ার পরেই তাকওয়া-পরহেযগারীর প্রভাব কতজন লোকের ওপর বর্তমান থাকে ? আল্লাহর আইন লংঘন করতে কতজন লোক ভয় পায় ? নেক কাজে কতজন লোক অংশগ্রহণ করে ? স্বার্থপরতা কতজনের দূর হয়ে যায় ?

ভেবে দেখুন, এর প্রকৃত কারণ কি হতে পারে ? আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, এর একমাত্র কারণ এই যে, মুসলমানদের মনে ইবাদাতের অর্থ এবং সেই সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল। তারা মনে করে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু না খাওয়া, কিছু পান না করাকেই রোযা বলে। আর এটা করার নামই ইবাদাত। এজন্য দেখা যায় যে, মুসলমান রোযার খুব সম্মান করে, খুব যত্নের সাথে রক্ষা করে চলে—তাদের মনে আল্লাহর ভয় এতবেশী হয় যে, যেসব কাজে রোযা ভংগ হবার আশংকা হয়, তা থেকে তারা দূরে সরে থাকে। এমনকি প্রাণের আশংকা দেখা দিলেও কেউ রোযা ভাংগতে রাজী হয় না। কিন্তু মুসলমানগণ একথা জানে যে, কেবল ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার নামই আসল ইবাদাত নয়, এটা ইবাদাতের বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। এ অনুষ্ঠান পালন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের মনে আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা জাগিয়ে তোলা মাত্র। তাদের মধ্যে যেন এতদূর শক্তি জেগে ওঠে যে, তারা বড় বড় লাভজনক কাজকেও কেবল আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে ভয় করে (নিজের মনকে শক্ত করে) তা পরিত্যাগ করে। আর কঠিন বিপদের কাজেও যেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজের মনকে শক্ত করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এ শক্তি মুসলমানদের মধ্যে তখনি আসতে পারে, যখন রোযার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে এবং রমযানের পূরা মাস আল্লাহর ভয় ও ভালবাসায় নিজের মনকে নফসের খাহেস হতে ফিরিয়ে রাখবে, আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রস্তুত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান মুসলমান সমাজ রমযানের পরেই এ অভ্যাসকে এবং এ অভ্যাসলব্ধ গুণগুলোকে এমনভাবে হারিয়ে ফেলে যেমন কেউ ভাত খেয়েই অমনি বমি করে ফেলে। উপরন্তু অনেক মুসলমান ইফতার করার সাথে সাথে সারাদিনের পরহেযগারী ও তাকওয়াকে উগরিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় রোযার আসল উদ্দেশ্য যে কোনো মতেই হাসিল হতে পারে না তা প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন। রোযা কোনো যাদু নয়, এর কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন করলেই তা দ্বারা বড় কোনো উদ্দেশ্য লাভ করা যেতে পারে না। ভাত হতে ততক্ষণ পর্যন্ত শারীরিক শক্তি লাভ করা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা পাকস্থলিতে গিয়ে হযম হবে এবং রক্ত হয়ে শরীরের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হবে। তদ্রূপ রোযা দ্বারাও কোনো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করা যেতে পারে না—যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদার রোযার আসল উদ্দেশ্য ভালভাবে বুঝতে না পারবে এবং তার মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে তা অংকিত না হবে এবং চিন্তা-কল্পনা, ইচ্ছা ও কর্ম সবকিছুর ওপর তা একেবারে প্রভাবশীল হয়ে না যাবে।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা রোযার হুকুম দেয়ার পর বলেছেন ঃ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ অর্থাৎ তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে সম্ভবত তোমরা মোত্তাকী

ও পরহেযগার হতে পারবে। আল্লাহ্ পাক একথা বলেননি যে, রোযার রেখে তোমরা নিশ্চয়ই পরহেযগার ও মোত্তাকী হতে পারবে। কারণ রোযা হতে যে সুফল লাভ করা যায় তা রোযাদারের নিয়ত, ইচ্ছা-আকাংখা ও আগ্রহের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যে ব্যক্তি এর উদ্দেশ্য জানতে ও ভাল করে বুঝতে পারবে এবং তা দ্বারা মূল উদ্দেশ্য লাভের চেষ্টা করবে সে তো কম বেশী মোত্তাকী নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু যে এর উদ্দেশ্যই জানবে না এবং তা হাসিলের জন্য চেষ্টা করবে না, রোযা দ্বারা তার কোনো উপকারই হবার আশা নেই।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নানাভাবে রোযার আসল উদ্দেশ্যের দিকে ইংগিত করেছেন এবং বুঝিয়েছেন যে, উদ্দেশ্য না জেনে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকায় কোনোই সার্থকতা নেই। তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ -

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করবে না তার শুধু খানা-পিনা পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনোই প্রয়োজন নেই।"

অন্য হাদীসে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ صِيَامِهٖ اِلاَّ الظَّمَاءُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ قِيَامِهٖ اِلاَّ السَّهَرُ -

"অনেক রোযাদার এমন আছে কেবল ক্ষুধা আর পিপাসা ছাড়া যার ভাগ্যে অন্য কিছুই জোটে না। তেমনি রাত্রিতে ইবাদাতকারী অনেক মানুষও এমন আছে, যারা রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না।"

এ দু'টি হাদীসের অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। এটা দ্বারা ভালরূপে জানা যায় যে, শুধু ক্ষুধার্ত ও পিপাসায় কাতর থাকাই ইবাদাত নয়, এটা আসল ইবাদাতের উপায় অবলম্বন মাত্র। আর আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর আইন ভঙ্গের অপরাধ না করা এবং যে কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, আর যতদূর সম্ভব নিজের আমিত্বকে নষ্ট করা যায় ; আল্লাহকে ভালবেসে সেসব কাজ ঐকান্তিক আগ্রহের সাথে পালন করা আসল ইবাদাত। এ ইবাদাত যে করতে পারবে না, সে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থেকে নিজের পেটকে কষ্ট দেয়, তার বার-চৌদ্দ ঘন্টা উপবাস থাকায় কোনোই লাভ নেই। আল্লাহ তাআলা কেবল এজন্যই মানুষকে

খানা-পিনা ত্যাগ করতে বলেননি। রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

"ঈমান ও এহতেসাবের সাথে যে ব্যক্তি রোযা রাখবে তার অতীতের গুনাহ-অপরাধ মাফ করে দেয়া হবে।"

ঈমান—অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে একজন মু'মিনের যে ধারণা ও আকীদা হওয়া উচিত তা স্মরণ থাকা চাই আর এহতেসাব-এর অর্থ এই যে, মুসলমান সবসময়েই নিজেও চিন্তা-কল্পনা করবে, নিজের কাজ-কর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে ও ভেবে দেখবে যে, আল্লাহর মর্জির খেলাফ চলছে না তো। এ দু'টি জিনিসের সাথে যে ব্যক্তি রমযানের পূর্ণ রোযা রাখবে, সে তার অতীতের সব গুনাহ্ অপরাধ মাফ করিয়ে নিতে পারবে। অতীতে সে কখনও নাফরমান আর আল্লাহদ্রোহী বান্দাহ থাকলেও এভাবে রোযা রাখলে প্রমাণিত হবে যে, এখন সে প্রকৃত মালিক আল্লাহর দিকে পুরোপুরি প্রত্যাবর্তন করেছে। হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَذَنْبَ لَهُ -

"গুনাহ থেকে যে তাওবা করে, সে একেবারে নিষ্পাপ হয়ে যায়।"

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْقَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ اِمْرُءٌ صَائِمٌ -

"রোযা একটি ঢালের ন্যায় (ঢাল যেমন দুশমনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, তেমনি রোযাও শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ)। সুতরাং যে ব্যক্তি রোযা রাখবে, তার (এ ঢাল ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়) দাঙ্গা-ফাসাদ থেকে ফিরে থাকা উচিত। কেউ তাকে গালি দিলেও কিংবা তার সাথে লড়াই-ঝগড়া করলেও পরিষ্কারভাবে বলা উচিত যে, ভাই, আমি রোযা রেখেছি, তোমার সাথে এ অন্যায় কাজে আমি যোগ দেব এমন আশা করতে পারি না।"

অন্য কয়েকটি হাদীসে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, রোযা রেখে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে নেক কাজ করা উচিত এবং প্রত্যেকটি ভাল কাজেই অংশগ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে রোযা রাখা

অবস্থায় রোযাদারের মনে তার অন্যান্য ভাইয়ের প্রতি খুব বেশী পরিমাণে সহানুভূতি থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ নিজে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হওয়ার দরুন খুব ভাল করেই অনুভব করতে পারে যে, আল্লাহর গরীব বান্দাহগণ দুঃখ ও দারিদ্র্যে কেমন করে দিন কাটায়। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রমযানে অন্যান্য সময় অপেক্ষা অধিক দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হতেন। এ সময় কোনো প্রার্থী তাঁর দুয়ার হতে বঞ্চিত হতে পারতো না। কোনো কয়েদীও এ সময়ে বন্দী থাকতো না। একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ شَئٌ -

"রমযান মাসে যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে ; তার এ কাজ তার গুনাহ মাফ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে বাঁচাবার কারণ হবে। এ রোযাদারের রোযা রাখায় যত সওয়াব হবে, তাতে তারও ঠিক ততখানি সওয়াব হবে। কিন্তু তাতে রোযাদারের সওয়াব একটুও কম হবে না।"

রোযা ও আত্মসংযম

রোযার অসংখ্য নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সুফল রয়েছে। মানুষের মধ্যে আত্মসংযমের শক্তি সৃষ্টি করা তার অন্যতম। রোযা মানুষের মধ্যে আত্মসংযমের শক্তি কিরূপে জাগ্রত করে, তা সম্যকরূপে বুঝার জন্য সর্বপ্রথম 'আত্মসংযম'-এর অর্থ জানা আবশ্যক। ইসলাম কোন্ ধরনের আত্মসংযমের পক্ষপাতী এবং রোযা মানুষের মধ্যে সেই শক্তি কিরূপে বিকশিত করে, তাও জেনে নেয়া অপরিহার্য কর্তব্য।

মানুষের 'খুদী'—আত্মজ্ঞান যখন তার দেহ এবং অন্যান্য শক্তিসমূহকে পরিপূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করে নিতে পারে এবং মনের যাবতীয় কামনা-বাসনা ও আবেগ-উচ্ছ্বাসকে নিজের সিদ্ধান্তের অধীন ও অনুসারী করে তুলতে পারে, ঠিক তখনই হয় আত্মসংযম। একটি রাষ্ট্রে প্রধান শাসনকর্তার মর্যাদা যেরূপ হয়ে থাকে মানুষের গোটা সত্তায় তার 'খুদী'রও ঠিক সেই মর্যাদাই হয়ে থাকে এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার হাতিয়ার। মানুষের দৈহিক ও মস্তিষ্কের শক্তি খুদীরই 'খিদমত' করে। নফস বা প্রবৃত্তি 'খুদী'র সামনে নিজের কামনা-বাসনার কেবল আবেদনই পেশ করতে পারে, আর কিছু করার মত ক্ষমতা তার নেই। এসব অস্ত্র ও শক্তিসমূহকে কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে এবং নফসের আবেদনকে মঞ্জুর করা হবে কিনা সেই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার একমাত্র 'খুদী'রই। এখন কোনো খুদী যদি দুর্বল হয়, দেহ রাজ্যে নিজের ইচ্ছামত শাসন চালাবার ক্ষমতা যদি তার না-ই থাকে এবং নফসের আবেদন যদি নির্দেশের অনুরূপ হয় তবে সেই 'খুদী' বড় অসহায়, পরাজিত ও নিষ্ক্রিয়। যে অশ্বারোহী নিজের অশ্বকে কাবু করতে পারে না, বরং সে নিজেই অশ্বের আয়ত্বাধীন হয় ; মানুষের এ খুদী ঠিক তারই মত অক্ষম। এ ধরনের দুর্বল মানুষ দুনিয়ায় কোনোদিনই সফল জীবনযাপন করতে পারে না। মানুষের ইতিহাসে যাঁরাই নিজেদের কোনো প্রভাব ও স্মৃতি চিহ্ন উজ্জ্বল করে রেখে গেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই নিজের আভ্যন্তরীণ সমগ্র শক্তিকে বল প্রয়োগ করে হলেও—নিজের অধীন ও অনুগত করে নিয়েছেন। তাঁরা কোনো দিনই নফসের লোভ-লালসার দাস এবং আবেগ-উচ্ছ্বাসের গোলাম হননি, তাঁরা সবসময়ই তার মনিব বা পরিচালক হিসেবেই রয়েছেন। তাঁদের ইচ্ছা-বাসনা অত্যন্ত মযবুত এবং সংকল্প অটল ছিল।

কিন্তু যে 'খুদী' নিজেই খোদা হয়ে বসে এবং যে 'খুদী' আল্লাহর দাস ও আদেশানুগামী হয়ে থাকে, এ দু' প্রকার খুদীর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য

রয়েছে। সফল জীবনযাপনের জন্য অনুগত 'খুদী' একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু যে খুদী সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে, বিশ্ব মালিকের অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করে না, বরং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যে 'খুদী' কোনো উচ্চতর নৈতিক বিধান মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, কোনো হিসেব গ্রহণকারীর কাছে জবাবদিহি করার ভয় যার নেই,' সে যদি নিজের দেহ ও মনের সমগ্র শক্তি নিচয়কে করায়ত্ব করে অত্যন্ত শক্তিশালী এক 'খুদী'তে পরিণত হয়, তবে তা দুনিয়ার ফেরাউন, নমরূদ, হিটলার ও মুসোলিনির ন্যায় বড় বড় প্রলয় সৃষ্টিকারীর-ই উদ্ভব করতে পারে। কিন্তু এরূপ আত্মসংযম কখনও প্রশংসনীয় হতে পারে না। ইসলামও এ ধরনের আত্মসংযম মোটেই সমর্থন করে না। প্রথমে মানুষের 'খুদী' নিজ আল্লাহ্‌র সামনে বিনয়াবনত হবে, আনুগত্যের মস্তক অবনত করবে, তাঁর সন্তোষ লাভের জন্য চেষ্টা করা এবং তাঁর আইনের আনুগত্য করাকেই নিজের প্রধান কাজ হিসেবেই গ্রহণ করবে, তাঁরই সামনে নিজেকে দায়ী মনে করবে— ইসলাম এরূপ 'খুদী'কেই সমর্থন করে। এরূপ অনুগত ও বিশ্বস্ত 'খুদী'ই স্বীয় দেহ ও শক্তি নিচয়ের ওপর নিজের প্রভুত্ব ক্ষমতা এবং তার মন ও কামনা-বাসনার ওপর স্বীয় শক্তি-আধিপত্য কায়েম করবে—যেন তা দুনিয়ায় সংস্কার সংশোধন করার জন্য এক বিরাট শক্তিরূপে মাথা তুলতে পারে।

বস্তুত এটাই ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মসংযমের প্রকৃত ও মূল কথা। রোযা মানুষের মধ্যে এরূপ আত্মসংযমের প্রবল শক্তি কিরূপে সৃষ্টি করে, এখন আমরা তাই আলোচনা করবো। নফস ও দেহের যাবতীয় দাবী-দাওয়া যাচাই করে দেখলে পরিষ্কাররূপে জানা যায় যে, তার মধ্যে তিনটি দাবী হচ্ছে মূল এবং ভিত্তিগত। বস্তুত এ তিনটিই অধিকতর শক্তিসম্পন্ন দাবী। প্রথমেই হচ্ছে ক্ষুন্নিবৃত্তির দাবী। জীবন রক্ষা একমাত্র এরই ওপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়, যৌন আবেগের দাবী। মানুষের বংশ তথা মানব জাতির স্থিতির এটাই একমাত্র উপায় এবং তৃতীয়, শান্তি ও বিশ্রাম গ্রহণের দাবী। কর্মশক্তিকে নতুন করে জাগ্রত এবং বলিষ্ঠ করে তুলার জন্য এটা অপরিহার্য। মানুষের এ তিনটি দাবী যদি নিজ নিজ সীমার মধ্যে থাকে, তবে তা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভাবধারার অনুরূপ হবে, সন্দেহ নেই। অন্যদিকে নফস ও দেহের কাছে এ জিনিসই হচ্ছে বড় ফাঁদ। একটু ঢিল—একটু সুযোগ পেলেই এ তিনটি ফাঁদ মানুষের খুদীকে বন্দী করে নিজের গোলাম—নিজের দাসানুদাস বানিয়ে নেয়। ফলে এর প্রত্যেকটি দাবীই সম্প্রসারিত হয়ে অসংখ্য দাবীর একটি সুদীর্ঘ ফিরিস্তি হয়ে পড়ে। একটি দুর্বল খুদী যখন এসব দাবীর কাছে পরাজিত হয়, তখন খাদ্যের দাবী তাকে পেটের দাস বানিয়ে দেয়, যৌনক্ষুধা তাকে পশু অপেক্ষাও নিম্নস্তরে ঠেলে দেয় এবং দেহের বিশ্রামপ্রিয়তা তার ইচ্ছাশক্তিকে

বিলোপ করে। অতপর সে আর তার নফস ও দেহের শাসক বা পরিচালক থাকে না, বরং সে তখন এর অধীন আদেশানুগত দাসে পরিণত হয় এবং এর নির্দেশসমূহকে—ভাল-মন্দ, সংগত, অসংগত সকল উপদেশ—পালন করে চলাই তার একমাত্র কাজ হয়।

রোযা নফসের এ তিনটি লালসা বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করে—নিয়মানুগ করে তোলে এবং 'খুদী'কে তার ওপর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারে অভ্যস্ত করে দেয়। যে খুদী আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এ রোযা তাকে সম্বোধন করে বলে ঃ আল্লাহ্ আজ সারাটি দিন পানাহার করাকে তোমার ওপর নিষেধ বা হারাম করেছে, এ সময়ের মধ্যে কোনো পবিত্র খাদ্য এবং সদুপায়ে অর্জিত কোনো খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করাও জায়েয নয়।

সে বলে ঃ আজ তোমার মালিক মহান আল্লাহ্ তোমার যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করার ওপরে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিতান্ত হালাল উপায়েও নফসের লালসা-বাসনা পূর্ণ করা তোমার জন্য হারাম করে দিয়েছেন। সে আরও বলে দেয় যে, সারাদিনের দুঃসহ ক্ষুধা পিপাসার পর যখন তুমি ইফতার করবে, তখন তুমি পরিশ্রান্ত হয়ে আরাম করার পরিবর্তে ওঠ এবং অন্যান্য দিনের চেয়েও বেশী ইবাদাত কর।

বস্তুত এতেই তোমার রাব্বুল আলামীনের সন্তোষ নিহিত আছে। রোযা তাকে এটাও জানিয়ে দেয় যে, বহু রাকাআতের নামায সমাপ্ত করে যখন বিশ্রাম করবে, তখন সকাল পর্যন্ত বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে থেকো না। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হলেও শেষ রাতে সেহরী খাওয়ার জন্য জাগো এবং সুবহে সাদেকের আলোকচ্ছটা ফুটে ওঠার পূর্বেই তোমার দেহকে খাদ্য দ্বারা শক্তিশালী করে তোল। খুদী রোযার এসব হুকুম-আহকাম মানুষকে শুনিয়ে তদনুযায়ী আমল করার সম্পূর্ণ ভার তার ওপরেই ন্যস্ত করে। তার পিছনে কোনো পুলিশ কোনো সি, আই, ডি, কিংবা প্রভাব বিস্তার করার মত শক্তি নিযুক্ত করা হয় না। সে যদি গোপনে খাদ্য গ্রহণ করে, কিংবা যৌনক্ষুধার পরিতৃপ্তি সাধন করে, তবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ তা দেখতে পায় না। তারাবীহ্ নামায পড়া থেকে বাঁচার জন্য সে যদি কোনো শরীয়াতী কৌশল অবলম্বন করে তবে কোনো পার্থিব শক্তিই তার প্রতিরোধ করতে পারে না। সবকিছুই তার নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। মু'মিন ব্যক্তির 'খুদী' যদি বাস্তবিকই আল্লাহর অধীন ও অনুগত হয়ে থাকে, তার ইচ্ছাশক্তিতে যদি নফসকে নিয়ন্ত্রিত করার মত ক্ষমতা থাকে, তবে সে নিজেই আহারের তীব্র

আগ্রহ, যৌনক্ষুধা ও লালসাকে এবং বিশ্রাম প্রিয়তাকে রোযার উপস্থাপিত অসাধারণ নিয়ম-নীতির বাঁধনে নিজেই মযবুত করে বেঁধে দেবে।

এটা কেবল একদিনেরই অনুশীলন নয়, এ ধরনের ট্রেনিং-এর জন্য মাত্র একটি দিন মোটেই যথেষ্ট নয়। ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘ ৩০টি দিন মানুষই মানুষের খুদীকে এমনি ট্রেনিং ও অনুশীলনের মধ্যেই অতিক্রম করতে হয়। বছরে একটি বার পুরো ৭২০ ঘন্টার জন্য এ প্রোগ্রাম রচনা করা হয় যে, শেষ রাতে জেগে সেহ্‌রী খাও, ঊষার শুভ্রচ্ছটার সূচনা হলেই পানাহার বন্ধ কর। সমগ্র দিন ভর সকল প্রকার খানাপিনা পরিহার কর। সূর্যাস্তের ঠিক পর মুহূর্তেই যথাসময়ে ইফতার কর। তারপর রাতের একটি অংশ তারাবীর নামাযে—যে নামায সাধারণত পড়া হয় না—অতিবাহিত কর। তারপর কয়েক ঘন্টা বিশ্রামের পর আবার নতুন করে কার্যসূচী অনুযায়ী কাজ শুরু করে দাও। এভাবে পুরো একমাস ধরে ক্রমাগত নফসকে তার তিনটি সবচেয়ে বড় এবং সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তিশালী দাবী ও লালসাকে এক কঠিন নিয়মের দুচ্ছেদ্য বাঁধনে আবদ্ধ করা হয়। এর ফলে 'খুদী'র মধ্যে একটি বিরাট শক্তি স্ফূরিত হয়, তা আল্লাহর মর্জি অনুসারে নিজের নফস ও দেহের ওপরে শাসন ক্ষমতা চালাতে সমর্থ হয়। পরন্তু সারা জীবনভর মাত্র একবারের জন্য এ প্রোগ্রাম করা হয়নি। বালেগ হবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক বছর দীর্ঘ একটি মাস এ কাজেই ব্যয়িত হয়। ফলে নফসের ওপর 'খুদী'র বাঁধন বার বার নূতন এবং শক্ত হয়ে যায়।

এরূপ শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য কেবল এটাই নয় যে, মু'মিনের 'খুদী' তার ক্ষুধা, পিপাসা, যৌনবৃত্তি এবং বিশ্রাম অভিলাষকেই আয়ত্ত্বাধীন করে নিবে আর কেবল রমযান মাসের জন্যই এরূপ হবে, এ উদ্দেশ্য তার নয়। মানুষের তিনটি সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে বেশী জোরদার ও শাণিত হাতিয়ারের সাথে মুকাবিলা করে তার 'খুদী' অন্যান্য সমগ্র আবেগ-উচ্ছ্বাস, হৃদয়বৃত্তি এবং সকল প্রকার লোভ-লালসাকে নিয়মানুগ ও বিধিবদ্ধ করে দেয়। তাতে এমন এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয় যে, কেবল রমযান মাসেই নয় অতপর বাকী এগারোটি মাস ধরে তা বলিষ্ঠ ও শাণিত থাকে এবং রীতিমত কাজ করে। এ সময় আল্লাহর নির্ধারিত প্রত্যেকটি কাজেই সে তার দেহ ও যাবতীয় শক্তি নিযুক্ত করতে পারে, আল্লাহর সন্তোষ লাভ হয় এমন প্রত্যেকটি ভাল কাজের চেষ্টা করতে পারে, আল্লাহর নিষিদ্ধ ও অমনোনীত প্রত্যেকটি পাপ কাজকে রুখে দাঁড়াতে পারে এবং তার যাবতীয় লোভ-লালসাকে আবেগ-উচ্ছ্বাস ও হৃদয় বৃত্তিতে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়। তার

নফসের হাতে ছেড়ে দেয় না, তাই যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই টেনে নিতে পারে না। প্রভুত্বের রজ্জু তার নিজের হাতেই ধরে রাখে। নফসের যেসব লালসাকে যে সময় যতখানি এবং যেভাবে পূর্ণ করার অনুমতি আল্লাহ্ তাআলা দিয়েছেন সে তাকে সেই নিয়ম অনুসারেই পূর্ণ করে। তার ইচ্ছাশক্তিও এতখানি দুর্বল হয় না যে, সে ফরযকে ফরয জেনে এবং তা পালন করার ইচ্ছা সত্ত্বেও পালন করতে পারে না। শুধু এজন্য দেহ রাজ্যের ওপরে সে প্রবল পরাক্রমশালী এক শাসনকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত এ শক্তি মানুষের অভ্যন্তরে মানুষের 'খুদী'তে সৃষ্টি করাই রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি রোযা রেখেও এ শক্তি লাভ করতে পারে না, সে নিজেকে ক্ষুৎ-পিপাসায় পরিশ্রান্ত ও জর্জরিত করেছে। তার উপবাস ও পানাহার পরিত্যাগ একেবারে নিষ্ফল।

কুরআন এবং হাদীস—দু'টিতে একথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা কাজ করা পরিহার করতে পারলো না, তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনোই আবশ্যকতা নেই। তিনি আরো বলেছেন যে, অনেক রোযাদার এমন আছে, যারা রোযা হতে ক্ষুৎ-পিপাসার ক্লান্তি ভিন্ন আর কিছুই লাভ করতে পারে না।

সমাপ্ত